গণতন্ত্র ধর্ম ও রাজনীতি

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীঅনিল মিত্র

মুদ্রক
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

সূচীপত্র

১

স্বাধীনতার রূপরেখা

স্বাধীনতা মানব জীবনের জন্মলব্ধ ঐশ্চর্য নয়। প্রয়াসলব্ধ কোন অন্তিম সিদ্ধিও নয়। লক্ষ লক্ষ বৎসরের জৈবিক বিবর্তন এবং কয়েক সহস্র বৎসরের সংগ্রাম-মুখর ইতিহাসের ফলশ্রুতি মাত্র। অপরাপর সমস্ত মানবিক মূল্যের মত স্বাধীনতার সংজ্ঞাও অনিবার্যভাবেই আপেক্ষিক। কারণ মানুষের জৈবিক বিবর্তনের পর্যায়, ইতিহাসের ধারা, দেশকালের সীমায় আবদ্ধ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো প্রভৃতির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতার সংজ্ঞাকে রূপদান করা সম্ভব। দেশকাল নিরপেক্ষ, নিরালম্ব নিরাকার তাত্ত্বিক স্বাধীনতা শুধু রূপহীন, অর্থহীন কল্পলোকের বিলাস মাত্র। কল্পলোকের সে নৈর্ব্যক্তিক স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়ে পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষের পরাধীনতাকে স্বচ্ছন্দে ঢেকে রাখা যায়। মহাশূন্যে কল্পলোক সৃষ্টির আনন্দে চিন্তা হয় ঊর্ধ্বমুখী। আর সে চিন্তা সহজেই মানুষকে বাস্তব পরিবেশের প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকতে, এবং নিজের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বিবেকযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পরিবর্তনশীল মানব সমাজে গতিময় মূল্যবোধের একটি ধারা মাত্র। মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম যদিও তার জৈবিক বিবর্তনের আদিযুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, তথাপি স্বাধীনতার চৈতন্য এবং মূল্যবোধ সে লাভ করেছে তুলনাক্রমে আধুনিক যুগে। এ চৈতন্য এবং মূল্যবোধও চিরন্তন হতে পারে না। কারণ বিবর্তন ও ইতিহাস থেমে নাই। স্বাধীনতার রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। মানব সমাজে স্বাধীনতার সংগ্রামেরও তাই কোন শেষ নেই। কিন্তু সে সংগ্রাম সর্বকালে সর্বলোকে প্রযোজ্য স্বাধীনতার কোন তাত্ত্বিক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। কারণ স্বাধীনতা

সমাজের ক্রমবিকাশেরই ফলশ্রুতি। অশুদ্ধ পৃথিবীতে ক্রমশ প্রতিফলিত বিশুদ্ধ কোন অপার্থিব, অলৌকিক পূর্ণসত্তা নয়।

মানুষের জৈবিক বিবর্তন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার স্বাধীনতা সংগ্রামেরই নামান্তর। সমগ্র জীবজগতের মধ্যেই এ সংগ্রাম অবিরত চলছে, কিন্তু মানুষ এ সংগ্রামে অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে বেশী সফল হয়েছে বলেই সে আজ প্রাণী জগতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে। প্রথমে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দুপায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে। তারপর দুই বাহু এবং বিবর্তনে উন্নত ধীশক্তির সাহায্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মোকাবিলা করতে শিখেছে। প্রথম পর্যায়ে সে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত, খরা বন্যা প্রভৃতি অমঙ্গলকর প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করত। এই পালিয়ে যাওয়াই ছিল তার স্বাধীনতা সংগ্রাম। পরবর্তীকালে সে গৃহনির্মাণ, এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাহায্যে আরও উন্নত ধরনের আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। কিন্তু প্রকৃতিকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ কিংবা জয় করবার চেষ্টা আরম্ভ হয় শুধুমাত্র সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক পর্যায়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বর্তমান কালে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এই সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহয্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ মহাকাশ জয়ের পথে ইতিমধ্যেই পা বাড়িয়েছে। কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিশ্বপ্রকৃতির এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মানুষ আজ পর্যন্ত জানতে পেরেছে, জয় করতে পেরেছে আরও অনেক কম। অনন্ত মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটন কিংবা নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, মানুষ আজও বৃষ্টিপাত, শীতগ্রীষ্ম, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি অতি সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ। অর্থাৎ মানুষ আজও প্রকৃতির বিপুল শক্তির কাছে প্রায় সম্পূর্ণ পরাধীন।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থ অবশ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করা নয়। কারণ প্রকৃতির জল, বাতাস, আবহাওয়া এবং সামগ্রিক পরিবেশের উপর তার জৈবিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল। অনেক দেরীতে মানুষ আজ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কলুষিত কিংবা ধ্বংস করলে তার নিজস্ব জৈবিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। আবার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের গভীর গোপন যোগসূত্র স্থাপনের ফলেই সৃষ্ট হয় কালজয়ী শিল্প, কবিতা, সুরের মুর্চ্ছনা, যার সঙ্গে মানব স্বাধীনতার বিকাশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অতএব প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত অর্থ অমঙ্গলকর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে প্রতিহত এবং নিয়ন্ত্রিত করা, আর প্রকৃতির গহনে নিহিত

সমস্ত শক্তিকে সংগ্রহ ও সংহত করে মানব সভ্যতার বিকাশে নিয়োজিত করা।

স্বাধীনতার জন্য মানুষের সংঘবদ্ধ সামাজিক সংগ্রাম তার জৈবিক বিবর্তনের পথে স্বাধীনতার প্রয়াস থেকে স্বতন্ত্র ইতিহাস, যদিও দুয়ের মধ্যে কিছুটা সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংঘবদ্ধ সামাজিক স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন উদাহরণ আমাদের জানা নেই। চীনদেশের প্রাচীন ইতিহাসে বিপুল কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাও জেডং বারবার বলেছেন যে তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত কম্যুনিস্ট বিপ্লব চীনের কৃষক বিপ্লবের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরেই পরিণতি। অবশ্য এসব প্রাচীন গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক কারণ, স্বরূপ এবং তাৎপর্য সম্বন্ধে তর্কাতীত প্রমাণ অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ নেই যে প্রাচীন চীনের এসব গণ-অভ্যুত্থানই সম্ভবত ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানুষের সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাচীনতম উদাহরণ। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেরোডোটাস প্রভৃতির চিন্তায় স্বাধীনতার তত্ত্বের কিছুটা বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এই তত্ত্ব ছিল একেবারেই আংশিক ধরনের। কারণ সর্বজনীন আর্থিক কিংবা সামাজিক স্বাধীনতার কোন উপকরণ এই তত্ত্বে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসে নগর-রাষ্ট্রের বাস্তব পরিবেশে শ্রেণীশোষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং যে ক্রীতদাস প্রথার উপর ভিত্তি করে তথাকথিত গ্রীক সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল, সে অমানবিক প্রথাকে প্রকৃতির নিয়ম বলে গণ্য করা হত। গ্রীক চিন্তকদের স্বাধীনতা তত্ত্ব অতএব প্রকৃতপক্ষে ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রোমান সাম্রাজ্যে আদি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের অহিংস প্রতিরোধই বোধ হয় সে যুগে ইউরোপে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু সে সংগ্রামও ছিল আংশিক স্বাধীনতা চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ তার মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের সচেতনতার উর্ধ্বে কোন বৃহত্তর রাজনৈতিক কিংবা আর্থিক স্বাধীনতার চৈতন্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনে ঈশ্বরের অতিজাগতিক রাজ্য এবং সিজারের জাগতিক রাজ্য, এই দুই রাজ্যের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যীশুখ্রীষ্টের বিখ্যাত নির্দেশকে ভিত্তি করেই আদি খ্রীষ্টধর্মীয়দের ধর্মীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। সিজারের জাগতিক রাজত্বকে কলুষমুক্ত করতে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অনাগ্রহী।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে স্বাধীনতার চিন্তা এবং সংগ্রাম দুই-ই লুপ্ত হতে বসেছিল। ধর্মীয় আবরণের অন্তরালে আর্থিক শোষণ, রাজনৈতিক স্বৈরাচার, অশিক্ষা এবং অপসংস্কৃতি সমস্ত ইউরোপীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

রেনেসাঁস এবং রিফরমেশন, বা চিন্তা ও সংস্কৃতির নবজন্ম এবং ধর্মসংস্কার, অর্থাৎ গ্রীক চিন্তার পুনরভ্যুত্থান এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মের আবির্ভাবের মাধ্যমেই ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আরম্ভ সূচিত হয়। আর ওই দুই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই নূতন করে প্রাণ সঞ্চার হয় ইউরোপীয় মানুষের স্বাধীনতার চিন্তা এবং প্রয়াসে। রুসো ও রোব্সপিয়ারের চিন্তাধারায় এবং ফরাসী বিপ্লবের আপাত অভীষ্টে এই স্বাধীনতার চেতনা জোরালো ভাবে প্রতিফলিত হয়। ফরাসী বিপ্লব অবশ্য স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় এক নৃশংস স্বৈরাচারী শাসন। আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আরম্ভ হয় নয়া সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ।

এদিকে ধনতন্ত্রের জন্ম এবং বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে ইংল্যান্ডে গড়ে উঠে ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্ব। এই তত্ত্বে সব মানুষের সমষ্টিগত স্বাধীনতার উপর জোর না দিয়ে ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একথা মনে করলে ভুল হবে যে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বের মধ্যে কোন সর্বজনীনতা ছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভোটাধিকার প্রধানত সম্পত্তির মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৯২৮ সালে নারীজাতির ভোটাধিকার লাভের পর ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বজনীন স্বাধীনতা তাত্ত্বিক দিক থেকেও সমর্থন করা হয়নি। সমর্থন করা হয়েছিল অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং মালিকানার স্বাধীনতা। তথাকথিত প্রকৃতির নিয়মে অসংখ্য মানুষের পরস্পরের সঙ্গে আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে এক স্বনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, সে ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তিমানুষ কিংবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে যোগান অথবা চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। রাষ্ট্র এই আর্থিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না, এবং এভাবেই সব মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্ব ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোর নৈতিক সমর্থন হিসেবেই গড়ে উঠেছিল, এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পর উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু আজও স্বাধীনতার এই তত্ত্ব এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা একমাত্র ধনতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে নেই।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই মার্কসবাদের জন্ম। কার্ল মার্কস্ একদিকে উপলব্ধি করেছিলেন যে সামাজিক ও আর্থিক উপকরণ এবং আঙ্গিক, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণীর ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবেই ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে তিনি বাধাবন্ধহীন আর্থিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধনতান্ত্রিক তত্ত্বের অসারতা এবং কুফল চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় বাস্তবে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সাম্য নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। স্বল্পসংখ্যক মানুষ আর্থিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো উভয়কেই নিজ শ্রেণীস্বার্থে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করে। এই ব্যবস্থায় অতএব মানুষের সামগ্রিক মুক্তি অসম্ভব। মার্কসের প্রথম জীবনের লেখায় মানব স্বাধীনতার গুরুত্বই অধিক। শেষ জীবনের লেখায় সমাজের আর্থিক রূপান্তরের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে মানব সমাজের সামগ্রিক মুক্তি কামনাই মার্কসবাদের আদি এবং মৌলিক প্রেরণা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় ইতিহাসে কিন্তু স্বাধীনতা চিন্তা কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন নজির নেই। *মনুসংহিতা* এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* প্রভৃতি গ্রন্থে রাষ্ট্রবিপ্লবের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লব বলতে সেখানে বর্তমানে প্রচলিত অর্থে গণবিপ্লব বোঝানো হয়নি, বৈদেশিক আক্রমণ কিংবা রাজায় রাজায় যুদ্ধই বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র ছাড়া মধ্যযুগীয় *শুক্রনীতিতেও* রাজার ঈশ্বরদত্ত রাজত্বের বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কোন অধিকার কিংবা স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি। বরঞ্চ সর্বত্র রাজাকে ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে পূজো করবার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণের ছিল যাগযজ্ঞ, পুজোপার্বণ এবং ধর্মীয় অনুশাসন রচনা করবার অধিকার, বৈশ্যের ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, আর শূদ্রের ছিল শুধুমাত্র অপর তিন জাতির মানুষের সেবা করবার অধিকার। অর্থাৎ সংখ্যাল্প তিন তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা পরস্পরের সহায়তায় সংখ্যগরিষ্ঠ তথাকথিত নিম্নবর্ণ শূদ্রদের শোষণ-শাসনের অবাধ অধিকার করায়ত্ত করেছিল, আর অগণিত সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের ন্যূনতম কোন অধিকার এবং স্বাধীনতাই ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে অত্যাচারী দেশী জমিদার অথবা নীলকর প্রভৃতি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত উদাহরণ

পাওয়া যায় সত্য। প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আরো আগে থেকেই বহিরাগত মহাজন, সুদখোর, জোতদার প্রভৃতি শোষক এবং তাদের সমর্থক পুলিশ ও বিদেশী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু স্থানীয় অভ্যুত্থানের নজির আছে। এগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৮৫৫-৫৭ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান ছিল অসহনীয় আর্থিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত স্থানীয় অভ্যুত্থান বিশেষ, কোন সচেতন স্বাধীনতা কামনা অথবা পূর্বপরিকল্পিত এবং সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন নয়। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ রাজত্বে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে বৃটিশ ও ফরাসী রাজনৈতিক চিন্তায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়ে কিছু সংখ্যক উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ এদেশে স্বাধীনতা চিন্তার সূত্রপাত করেন এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ভারতের বর্তমান সংবিধান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এই চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি।

চিন্তা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বর্তমান কালে প্রকৃত স্বাধীনতার একটি রূপরেখা সহজেই প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, প্রকৃত স্বাধীনতা কোন ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণী বিশেষের সম্পদ হতে পারে না। যে স্বাধীনতা জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে উপভোগ করতে পারে, তাই প্রকৃত স্বাধীনতা। অল্পসংখ্যক মানুষ যদি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধিকাংশ মানুষের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যায়, তবে তার নাম সামগ্রিক অর্থে স্বাধীনতা হতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসে বার বার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এ ধরনের তথাকথিত স্বাধীনতারই আবির্ভাব ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে সমাজের অধিকাংশ মানুষ তো স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ই। এমনকি ' চমেয় শোষক ও অত্যাচারী মানুষেরাও তাদের কলঙ্কিত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কারণ উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, ভয় এবং অত্যাচার-অবিচারজনিত অবশ্যম্ভাবী আত্মগ্লানি তাদের স্বার্থান্বেষী জীবনের স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে। সমাজের শান্তির ভয়ে তারা নিজেদের গড়া মিথ্যার প্রাচীরে নিজেরাই বন্দী হয়ে থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতাকেও সামগ্রিক স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু সংখ্যালঘুর স্বাধীনতার চেয়ে সংখ্যগুরুর স্বাধীনতা মানুষের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ।

একই কারণে স্বাধীনতার একটি আন্তর্জাতিক রূপ থাকাও অবশ্যম্ভাবী। গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের আমল থেকেই দেখা গেছে যে কোন কোন দেশের শাসকশ্রেণী মুখে স্বাধীনতার বুলি আওড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে স্বদেশী জনসাধারণকে দমন ও শোষণ করেছে তাই নয়, বিদেশেও আগ্রাসন, দমন ও শোষণ চালিয়ে কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছে। আধুনিক যুগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তথা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এই ভন্ডামি এবং বর্বরোচিত স্বাধীনতা তত্ত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইংল্যান্ডের শাসকশ্রেণী এবং তাদের মুখপাত্র চিন্তকেরা যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার তত্ত্ব নির্মাণে কঠোর পরিশ্রম করছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য তখন প্রবল বেগে পৃথিবীকে গ্রাস করতে এগিয়ে চলেছে। জন স্টুয়ার্ট মিল যখন ব্যক্তিস্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, যা নাকি আজও উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ায় স্বাধীনতা তত্ত্বের মূল শাস্ত্র বিশেষ, তখনই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তুঙ্গী ছিল, যেখানে সূর্য কখনও অস্তমিত হত না। প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ ছাড়াও বিদেশ নীতির মাধ্যমে পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটানো যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 'ব্যক্তিস্বাধীনতার পীঠস্থান' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিদেশনীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ণবিদ্বেষী সংখ্যালঘু শ্বেতকায় শাসকশ্রেণীর অধীন যে দক্ষিণ আফ্রিকা বহুকাল যাবৎ মানব সভ্যতার কলঙ্করূপে দাঁড়িয়ে ছিল, তার সঙ্গে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় রাজনৈতিক, সামরিক এবং আর্থিক সম্পর্ক। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্র্যাংকোর স্পেন এবং সালাজারের পর্তুগাল, অর্থাৎ দুটি ইউরোপীয় বীভৎস ফাসিস্ট সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের স্থান অধিকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ বৎসর ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে গেছে। সৌদি আরব, পাকিস্তান সহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সমস্ত স্বৈরাচারী এবং সামরিক শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর আঁতাত রয়েছে এবং সক্রিয় মার্কিন সমর্থন ও সাহায্য না পেলে এসব দেশের স্বৈরাচারী সরকারগুলি জনতার রোষে হয়ত বা অনেক আগেই ভেঙ্গে পড়ত। অর্থাৎ দমন এবং শোষণমূলক আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতার বিকাশ সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী অথবা আধাসাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক কাঠামোর পরিবেশে দমন ও শোষণকারী দেশগুলির শাসকশ্রেণী কর্তৃক প্রচারিত ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মানবিক অধিকারের তত্ত্ব মৌলিক ঘটনা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবার তস্করসুলভ প্রয়াস মাত্র।

কাঠামোগত দিক থেকে বিচার করলে মানব স্বাধীনতায় আর্থিক কাঠামোর গুরুত্বই সর্বাধিক। দারিদ্র্য স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান শত্রু। বিত্তবানের স্বাধীনতা বিত্তহীনের স্বাধীনতাকে অনিবার্যভাবেই হরণ করে। যে প্রাকৃতিক নিয়মে শক্তিহীন মেষশাবক শক্তিমান সিংহের শিকার হয়, সেই বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির নিয়ম মনুষ্য সমাজে চলতে দিলে বিত্তহীনেরাও বিত্তবানদের শিকার হয়ে পড়ে। সিংহ এবং মেষশাবকের স্বাধীনতা অরণ্যের প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় যে রকম, বিত্তবান ও বিত্তহীনদের অনিয়ন্ত্রিত সমান স্বাধীনতাও মনুষ্য সমাজে ঠিক সেরকম। যে বুভুক্ষু মানুষ দুইবেলা অন্নসংস্থানের চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়, নিজের এবং নিজ সন্তানদের জন্য ন্যূনতম বাসস্থান, পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা যার নাগালের বাইরে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার তত্ত্বের মূল্য তার কাছে কতটুকু? দারিদ্র এবং শোষণের পটভূমিতে স্বাধীনতার উন্মেষ কদাপি সম্ভব নয়। উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ায় ধনতন্ত্রবাদের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এখানেই ব্যর্থতা। এই তত্ত্ব ধরে নিয়েছিল যে আর্থিক ক্ষেত্রে আমজনতার সমান পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়মে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য সমাজ কোন প্রকৃতির নিয়মে স্বনিয়ন্ত্রিত হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে একচেটিয়া পুঁজির শ্রীবৃদ্ধিতে, আর তার ফলে প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণের অধিকাংশ পর্যবসিত হয়েছে বিত্তহীন ক্রীতদাস সুলভ শ্রমিক শ্রেণীতে।

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি নিয়েই সমাজতন্ত্রের, বিশেষত মার্কস্‌বাদের জন্ম। মার্কস এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ক্রীতদাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্র প্রভৃতি সমাজ ব্যবস্থার আর্থিক কাঠামোতে অনিবার্যভাবেই একটি ক্ষুদ্র শোষকশ্রেণী অগণিত বিত্তহীন মানুষকে শোষণ ও শাসন করে। আর রাষ্ট্রযন্ত্র মূলত বিত্তবানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এসব কাঠামোর মধ্যে বাস করে সাধারণ মানুষের পক্ষে মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। একমাত্র বিত্তের ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করে সমষ্টিগত মালিকানার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেই বিত্তহীনদের পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। আর ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিত্তহীন শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা।

তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোও কোন দেশের মানুষের স্বাধীনতার বিশেষ মান নির্ণায়ক। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনে

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলি সস্তা কাঁচা মাল ও সস্তা মজুরের উৎস এবং চড়াদামে শিল্পজাত পণ্য বিক্রির বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই ঔপনিবেশিক শোষণই এসব দেশের বর্তমান দারিদ্র্য ও অনুন্নত আর্থিক পরিস্থিতির প্রধান কারণ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসব উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক কাঠামোর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। অসম বাণিজ্যিক লেনদেনের হার, রাজনৈতিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত ঋণদান ব্যবস্থা, বহুজাতিক সংস্থাগুলির শোষণমূলক কার্যকলাপ ও দুর্নীতি, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির উপর উত্তর-পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের হার প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এখনও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় আর্থিক শোষণ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই আর্থিক শোষণ ও আধিপত্যের সাহায্যে তাদের বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা নীতি, এমনকি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে পর্যন্ত প্রভাবিত করছে। এই অবস্থায় অনুন্নত দেশগুলির কেবলমাত্র বাহ্যিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু?

স্বাধীনতার বিকাশের পথে কোন দেশের সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বও কম নয়। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে যে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, তা মানব স্বাধীনতার গুরুতর প্রতিবন্ধক। কারণ এই সামাজিক কাঠামোতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে আজন্ম সংখ্যাল্প কয়েকটি তথাকথিত উচ্চ জাতির আজ্ঞাবহ দাস করে রাখা হয়েছে। খেটে খাওয়া এই বিপুল জনসাধারণের নাম শূদ্র। তাদের মধ্যে আবার এক বড় অংশকে অস্পৃশ্য আখ্যা দিয়ে ক্রীতদাসের চাইতেও নিকৃষ্ট সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। এরা ভারতের মোট জনসংখ্যার পনেরো শতাংশ, এবং সামাজিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকেই সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করে আছে। আরও সাড়ে সাত শতাংশ আদিবাসী অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতের সমাজ জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, শোষিত এবং নিষ্পেষিত। এ ধরনের সারি সারি লৌহ প্রাকারে বিভক্ত এবং আবদ্ধ সমাজে স্বাধীনতার স্ফূরণ কদাপি সম্ভব নয়। উত্তর-পশ্চিম থেকে আমদানী করা রাজনৈতিক গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হলেও জাতপাত ভিত্তিক সামাজিক কাঠামোই রাজনীতির প্রকৃত রূপায়ণ করছে, এবং সেখানে স্বাধীনতা, সাম্য অথবা মৈত্রীর মৌলিক মূল্যবোধের চিহ্নমাত্র নেই। প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতপাতের

বাধাবন্ধ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং অন্য অনেক অপসংস্কৃতিকে চিরায়ত করা হত। ব্যক্তিমানুষের তথা সমাজের সামগ্রিক স্বাধীনতার পথ দুর্লঙ্ঘ্য বাধায় রুদ্ধ করা হত। প্রাচীনপন্থী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই গ্রাম্য সমাজ আজও এদেশে বর্তমান, এবং এ সমাজের স্বৈরাচারী শাসন থেকে কোন মানুষের অব্যাহতি নেই। জাতিভেদ ও সামাজিক স্বৈরাচারের এই কাঠামোকে সমূলে উচ্ছেদ করে বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ না করতে পারলে মানব স্বাধীনতা এদেশে শুধু মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর স্বপ্নই থেকে যাবে।

অর্থাৎ রাজনৈতিক গণতন্ত্র নামে একটা স্বতন্ত্র কাঠামো আছে, যা নাকি স্বাধীনতার ধারক ও বাহক, উত্তর-পশ্চিম থেকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের দ্বারা আমদানী করা এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ধনতন্ত্রের অসাম্য ও শোষণকে ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে, এবং এই আর্থিক কাঠামোর তাত্ত্বিক সমর্থনের উদ্দেশ্যেই এই তত্ত্ব রচিত হয়েছিল। মানুষ এক অবিভাজ্য সত্তা। সামাজিক মানুষ এবং অর্থনৈতিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক মানুষ নামে কোন আলাদা সত্তা নেই। কিন্তু এই কল্পিত স্বতন্ত্র সত্তার উপর ভিত্তি করেই উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো অঙ্গাঙ্গি এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অতএব পরস্পর অবিভাজ্য। আর্থিক কিংবা সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া আলাদা কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব নয়। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা কোন অপার্থিব বস্তু নয়, সামাজিক এবং আর্থিক কাঠামো থেকেই উদ্ভূত মানবিক মূল্য বিশেষ। বিদেশ থেকে আমদানী করা স্বাধীনতার তত্ত্বকেও কোন দেশের বাস্তব আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই বিচরণ করতে হয়। আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামোর বিশেষ বাস্তব গন্ডী পেরিয়ে এহেন তত্ত্বের পক্ষে কোন বিমূর্ত গৌরব অর্জন করা সম্ভব নয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেশকাল ও পরিবেশ নির্ভর এবং আপেক্ষিক। ইতিহাসের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ের স্বাধীনতার তুলনা করা চলে, কিন্তু পরস্পরের মানদন্ডে বিচার করা চলে না। আর কোন স্বয়ম্ভু, দেশকালের অতীত এবং অন্তিম স্বাধীনতাও থাকতে পারে না। অতএব ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং মূল্য আছে। গ্রীক এবং রোমান সভ্যতায় সর্বজনীন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না, এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের সঙ্গে স্বাধীনতার

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে কোন চৈতন্যও ছিল না। কিন্তু কিছুসংখ্যক মানুষের সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের রীতির মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার তত্ত্বের পূর্বাভাস ছিল, তা সে স্বাধীনতা যতই আংশিক হোক না কেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের মধ্য দিয়ে যে আংশিক স্বাধীনতার বিকাশ হয়েছিল, তার পরিণতি হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর আদর্শে। ফরাসী বিপ্লব কার্যত বিফল হলেও মানব মূল্যভিত্তিক এই তিন আদর্শ মার্কসবাদ সহ পরবর্তী কালের সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে এবং আজও ইতিহাসের পথের দিশারি রূপে কাজ করছে। ধনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ায় গড়ে ওঠা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ স্বাধীনতার আর এক আংশিক প্রকাশ। কিন্তু অত্যাচারী রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের নেতিবাচক অধিকার স্বাধীনতার তাত্ত্বিক অনুধাবন এবং চেতনার উন্মেষের দিক থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শোষণভিত্তিক আর্থিক কাঠামোর সঙ্গে এই তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কজনিত কুফলের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে জন্ম নেয় সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতার তত্ত্ব। মানব সভ্যতার প্রগতির পথে এই তত্ত্ব নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে এই তত্ত্ব আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

রুশ বিপ্লবের পর থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের সামগ্রিক স্বাধীনতার মার্ক্সীয় স্বপ্ন কতখানি সফল হয়েছে সে বিষয়ে গুরুতর মতদ্বৈধ আছে। কি কি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কারণে সেই স্বপ্নের রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্ভুত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মাপকাঠিতে পরবর্তীকালে ভিন্নতর ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে বিচার করা চলে না। দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ সমাজতান্ত্রিক দেশে সামগ্রিক স্বাধীনতার কতখানি বিকাশ হয়েছে তা বিচার করতে হবে সে দেশের বাস্তব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই, কোন কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের অবাস্তব মূল্যবোধের ভিত্তিতে নয়। রুশ বিপ্লবের পর থেকে সব সমাজতান্ত্রিক দেশেই জাতীয় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করে এবং সমষ্টিগত মালিকানা প্রবর্তন করে বিত্তহীনদের স্বাধীনতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ রচিত হয়েছে। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক সামগ্রিক স্বাধীনতার আদর্শ যত অসম্পূর্ণই

থাকুক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতার আদর্শ ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সেখান থেকে ইতিহাসের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ফিরে যাবার আর পথ নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পটভূমিতে স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের জন্য সংগ্রামই মানব সভ্যতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী পদক্ষেপ।

বলা বাহুল্য, এতক্ষণ যে ধরনের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করা হল, তা মানুষের জাগতিক, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের স্বাধীনতা। তথাকথিত আধ্যাত্মিক মুক্তি বা অন্তরের স্বাধীনতা নয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের উপসংহারে আসবার আগে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা চিন্তার ইতিহাসে এই অন্তরের স্বাধীনতার এক নেতিবাচক ঐতিহ্য রয়েছে, যা প্রধানত ধর্মভিত্তিক। যিশুখ্রীষ্ট যে মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের রাজ্য আর বাইরে সিজারের রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্যেও জগদ্বিমুখতা এবং ব্রহ্মবিহারী আদর্শের মাধ্যমে জীবন্মুক্তির তত্ত্ব সুপ্রাচীন। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মধ্যেও জাগতিক কর্মের নিবৃত্তির মাধ্যমে ইহলোকে মুক্তি এবং পরলোকে নির্বাণের তত্ত্ব দৃঢ়মূল। ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মের মিস্টিক বা মরমিয়াদের মধ্যেও এই তত্ত্বের প্রচলন আছে। ধর্মের সূত্র ধরে অথবা অন্যভাবে মনবাদী দার্শনিকদের একাংশও এই অন্তরের স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এ ধরনের অন্তরের স্বাধীনতা তত্ত্বের সারমর্ম এই যে ঐশ্বরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যে মানুষের জাগতিক কর্মের, অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের নিবৃত্তি হয়েছে, অথবা অন্তরের ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে যিনি পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছেন, তিনি সতত এবং সর্বত্র স্বাধীন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনেও স্বাধীন, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও স্বাধীন, অসম এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজেও স্বাধীন, দারিদ্রেও স্বাধীন, কারাগারের অভ্যন্তরেও স্বাধীন, মৃত্যুর মুখেও স্বাধীন। অতএব উক্ত কিংবা অনুক্ত উপদেশ এই যে এ ধরনের অন্তরের স্বাধীনতা মনুষ্য সমাজের আদর্শ হওয়া উচিত।

এক দিক থেকে বিচার করলে এই তথাকথিত অন্তরের স্বাধীনতা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ যে জাগতিক বাসনার নিবৃত্তির উপর এ ধরনের স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তা বড় জোর আংশিক নিবৃত্তি মাত্র। কারণ তথাকথিত

জীবন্মুক্ত মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি ন্যূনতম জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মরত জাগতিক মানুষের দানের উপর নির্ভর করতে হয়, এবং সেজন্য সদুদ্দেশ্যে দানের মাধ্যমে অর্থের সদ্ব্যবহারের তত্ত্ব অনুগামীদের কাছে প্রচার করতে হয়। একই কারণে তাঁরা বিত্তহীন অনাগামীদের অবহেলা এবং বিত্তবান অনুগামীদের বিশেষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে নিবৃত্তি মার্গের তত্ত্ব মানুষকে সমাজের প্রতি তার নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে প্ররোচিত এবং সাহায্য করে। অতএব এই তত্ত্ব মানুষের ব্যবহারিক জীবনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিহত করে, এবং এভাবে মানব সভ্যতার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথাকথিত অন্তরের স্বাধীনতা ব্যবহারিক জীবনে স্বাধীনতার অভাবের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধের অসামর্থ্য থেকে মানসিক পলায়নের একটা পথমাত্র। শুধুমাত্র অন্তরে স্বাধীন মানুষ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য সমাজ থেকে পলাতক এক নৈতিক আসামী, এবং আক্ষরিক অর্থেই এক অসামাজিক জীব। সমাজবিজ্ঞানে অতএব এহেন স্বাধীনতার কোন স্বীকৃতি নেই। অন্তরের স্বাধীনতায় মানুষের হয়ত একটা প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা জাগতিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে কিংবা তার বিকল্প হিসেবে নয়। সমষ্টিগতভাবে জাগতিক স্বাধীনতা অর্জন, উপভোগ এবং উত্তরণের পরই মানুষের অন্তরের স্বাধীনতা বিকাশের সুযোগ আসা সম্ভব।

ব্যবহারিক স্বাধীনতা সম্বন্ধেও একটি অর্ধনেতিবাচক এবং একটি ইতিবাচক মতবাদ আছে। প্রথমটি প্রধানত ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে, আর দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক সমষ্টিগত স্বাধীনতার তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিমানুষের জীবনের একটি নিজস্ব পরিধি আছে, যার মধ্যে সে ইচ্ছেমত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবার, ধর্মচর্চা করবার, মতামত প্রকাশ করবার এবং অন্যান্য আরও কতকগুলি স্বাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই পরিধির ভেতরে রাষ্ট্র কিংবা অপর কোন মানুষ হস্তক্ষেপ করবে না। এই হস্তক্ষেপ না করবার নামই স্বাধীনতা। জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আজও উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ার স্বাধীনতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য, এই হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবীই তার সারাংশ। মনুষ্য সমাজের পুরাতন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন কাঠামো তৈরি করা, মানুষের যৌথ প্রয়াসের ফলে সমষ্টিগত জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের নব নব দ্বার উন্মোচনের কোন ইঙ্গিত এই নেতিবাচক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে নেই। স্বাধীনতা এখানে হস্তক্ষেপহীনতার বিন্দুতে এসে স্তব্ধ এবং চিরন্তন হয়ে

আছে। এই তত্ত্ব ধনতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু মানব স্বাধীনতার বিবর্তন এবং ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করেনি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অপরপক্ষে স্বাধীনতার সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করে ব্যাপক অর্থে সামাজিক পরিবেশের কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সমষ্টিগত স্বাধীনতার ক্রমবিকাশের উপর। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এই ইতিবাচক তত্ত্বের সত্যতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার আদান-প্রদান এবং ঘাত-প্রতিঘাতেরই ফলশ্রুতি। পরিবেশ থেকে সে অনেক রকম বিক্ষেপ (stimulus) পায়, যার কতকগুলি তার জৈবিক অস্তিত্বের পরিপন্থী, অতএব কষ্টকর। আর অন্য কতকগুলি তার জৈবিক অস্তিত্বের অনুকূল এবং পরিপূরক, অতএব সুখপ্রদ। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে কষ্টকর বিক্ষেপগুলির কাছে থেকে সরে যায়, অথবা তাদের পরিবেশগত উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। যেমন সে বন্যা থেকে কিংবা জমিদারের অত্যাচার থেকে পালিয়ে যায়, অথবা নদীস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে কিংবা জমিদারী প্রথার বিলোপ করে পরিবেশগত কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করে। অন্য দিকে মানুষ সুখপ্রদ বিক্ষেপসমূহকে আপন করে নেয় এবং তাদের পরিবেশগত উৎসগুলিকে পরিবর্ধিত এবং সম্প্রসারিত করে। যেমন সে সুজলা, সুফলা ভূমিতে বসতি স্থাপন করে, ভালোবাসার পাত্রকে কাছে টানে, এবং আর্থিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উৎসমুখ খুলে দেবার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে। মূলত এভাবেই মানব স্বাধীনতার উন্মেষ হয়। পরিবেশের বাইরে অথবা ঊর্ধ্বে ব্যক্তি মানুষের কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা কিংবা স্বাধীনতা নেই। অবিরাম পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমেই অতএব মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ সম্ভব। এই পরিবর্তনের পেছনে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজন, তেমনি মানুষের সমষ্টিগত সংগঠন এবং উদ্যোগেরও প্রয়োজন। এ ধরনের যৌথ প্রয়াসেই মানুষের জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য, কর্মক্ষমতা, সৃজনীশক্তি, ধীশক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। বিবর্তন ও ইতিহাসের রাজপথ ধরে এহেন স্বাধীনতার পথেই মানব সমাজ এগিয়ে চলেছে। সে চলার পথের যদি কোন শেষ থাকে তবে তা এখনও মহাভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু স্বাধীনতার রূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও ইতিহাসধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষের যৌথ প্রয়াসে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের সুপরিকল্পিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

২

দারিদ্র্য ও স্বাধীনতা

উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ার চিন্তকদের চিন্তাধারায় স্বাধীনতার সংজ্ঞা মূলত রাজনৈতিক। স্বাধীনতার তত্ত্ব অতএব সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংগ হিসেবেই গড়ে উঠেছে। এই রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে ব্যক্তিমানুষের কতগুলি জন্মলব্ধ মৌলিক কিংবা মানবিক অধিকার আছে, যথা ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিত্তের মালিকানার স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, ইত্যাদি। সমাজ জীবনে রাষ্ট্র এমন কোনভাবে হস্তক্ষেপ করবে না যাতে এসব মানবিক অধিকার বা স্বাধীনতা খর্ব অথবা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের এহেন মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষার মাধ্যমে মনুষ্য সমাজের সামগ্রিক স্বাধীনতা নিশ্চিত এবং নিরাপদ হবে।

স্বাধীনতার এই রাজনৈতিক তত্ত্বে দেশের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর অসম বিন্যাস এবং তার অংগীভূত অবিচার ও শোষণের ফলে বাস্তবক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের স্বাধীনতা যে সামূহিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে, এবং ফলিত স্বাধীনতা যে প্রকৃতপক্ষে কপোলকল্পিত তাত্ত্বিক স্বাধীনতার বিপরীত মূর্তি ধারণ করতে পারে, উত্তর-পশ্চিমী রাজনৈতিক চিন্তকদের ভাবধারায় এ সত্যের প্রতিফলন বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। অথচ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ এই অবাস্তব ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বেই শিক্ষিত হয়েছে। আর স্বাধীনতোত্তর যুগে পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না হবার ফলে, এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে, আমাদের চিন্তাজগতে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক এ ধরনের স্বাধীনতা তত্ত্বই প্রায় চিরস্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছে।

উত্তর-পশ্চিমী চিন্তকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বে সব মানুষকে সমমানের একক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন দেশেই সব ব্যক্তিমানুষ স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমমানের একক নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিন্যাস অনুযায়ী ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠী অথবা শ্রেণী বিশেষের আত্মবিকাশ এবং ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য তারতম্য হয়। এর মধ্যে আবার আর্থিক কাঠামোর বিন্যাস, বিশেষত বিত্তের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিভাজন, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিত্তের মালিকেরা অনিবার্যভাবেই বিত্তহীনদের একমাত্র সম্বল তাদের শ্রমশক্তির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং নিজেদের মুনাফার স্বার্থে এই শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে। আর বিত্তের অনন্ত মহিমায় তারা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর উপরও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর-পশ্চিমী চিন্তাধারার মূল স্রোতে কাঠামোগত অসাম্যের এই চিত্রটি ফুটে ওঠেনি বলে মানুষের পরাধীনতার সংগে তার দারিদ্রের অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্কও বিশেষ আলোচিত হয়নি।

সমগ্র প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই বিবর্তনে উন্নত শারীরিক কাঠামো এবং ধীশক্তির সাহায্যে সৃজন ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছে। এই সৃজনীশক্তির মাধ্যমেই সে আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশে সক্ষম, যার আরেক নাম স্বাধীনতা। দারিদ্র্য মানব স্বাধীনতার প্রবলতম শত্রু, কারণ সে মানুষকে জড় প্রয়োজনের অবমানবীয় বন্ধনীর মধ্যে নিশিদিন আবদ্ধ রাখে, আর এভাবে তার সৃজনীশক্তি ও আত্মবিকাশকে নিয়ত প্রতিহত করে। ন্যূনতম জৈবিক প্রয়োজনের অকরুণ বন্ধন থেকে মুক্তি এবং মনজগতে বিচরণের সময় ও সুযোগ না পেলে অবমানবীয় অস্তিত্বকে উত্তরণ করে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। দারিদ্র্য অতএব পরাধীনতারই নামান্তর।

বলা বাহুল্য, দারিদ্র্যের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ এই যে সে আর্থিক ক্ষেত্রে দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা এবং তৎসহ অনিবার্য পরাধীনতা ডেকে আনে। বিত্তহীন দরিদ্র মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম করেও অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, নিজের এবং নিজ পরিবারের জন্য ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয়। অতএব অনিবার্য ভাবেই সে বিত্তবান, অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রার্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, এবং এভাবে যুগপৎ নিজের মানবিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। এই আর্থিক বন্ধন এবং পরাধীনতার পাশ থেকে দরিদ্র মানুষের মুক্তি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ বিত্তবান 'মহাজন' পাইথনের মতই

বেষ্টনীর সংখ্যা এবং চাপের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে করতে এক সময়ে হয়ত বা দরিদ্রের শেষ নিঃশ্বাসটুকুও কেড়ে নেয়।

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই জনসাধারণের বিপুল সংখ্যগরিষ্ঠ অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। যে কোন দেশে এই বিপুল দরিদ্র জনতার যে কোন অংশের দিকে লক্ষ্য করলেই দারিদ্র্যের সংগে আর্থিক পরাধীনতার এই অমোঘ কার্যকারণ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ এদেশের দলিত এবং আদিবাসীদের কথা ধরা যাক। দলিতেরা প্রায় সকলেই ভূমিহীন, বিত্তহীন, নিঃস্ব, সর্বহারা। এদেশের ইতিহাসের আদিকাল থেকেই তারা ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর, মুচি, মেথর হিসেবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে বিত্তবান শ্রেণীদের ভোগে নিজেদের জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই রক্তঝরা জীবনপাতের ফলে তাদের ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক পরাধীনতা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে মাত্র। অভাবের তাড়নায়, ঋণের দায়ে, তথা সমাজের দুর্লংঘ্য অনুশাসনে লক্ষ লক্ষ দলিত নিজেদের একমাত্র সম্বল কায়িক শ্রমটুকুও সুদখোর, জমিদার এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের রক্তচোষাদের ভোগে বিনা মজুরিতে বংশানুক্রমে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার তাদের পরিবারের নারীরা বংশানুক্রমে শিকার হয়েছে সেই নরপশুদের। আর প্রাচীন কাল থেকেই প্রশাসন যন্ত্র শোষক শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে রাষ্ট্রশক্তির কাছে ন্যায় বিচার কোনদিনই এদের ভাগ্যে জোটেনি।

এদেশের আদিবাসী সমাজের দারিদ্র এবং পরাধীনতাও সমান শোচনীয়। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে আদিবাসীরা এক ধরনের আদিম সাম্যবাদী সমাজে বাস করতো, যেখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না এবং দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে বাইরের শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে ব্যবসায়ী এবং সুদখোরদের আনাগোনা শুরু হল, আর সেই সংগে আরম্ভ হল আদিবাসী সমাজের দাসত্ব। সরলপ্রাণ আদিবাসীদের সংগে ব্যবসায়ের নামে নরখাদকেরা প্রথমে তাদের ওজনে ঠকালো, দামে ঠকালো, হিসেবে ঠকালো। তারপর মিথ্যে দেনার দায়ে তাদের বংশানুক্রমে অবৈতনিক দাসে পরিণত করলো। আর তাদের যৌথ মালিকানার জমিজমা নিজেদের নামে হস্তান্তরিত করলো। ইংরেজ সরকার শোষক শ্রেণীর উপর রাজস্বের জন্য নির্ভরশীল ছিল বলে, আর দেশের মানুষের কল্যাণে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না বলে, প্রশাসন যন্ত্র শোষকদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হত। শোষণ ও অত্যাচার সব সীমা ছাড়িয়ে গেলে মাঝে মাঝে

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ দেখা দিত, যার অন্যতম সুবিদিত বহিঃপ্রকাশ ছিল ১৮৫৫-৫৭ সালের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে শোষক ও শাসক শ্রেণী অচিরেই আবার তাদের দাসত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতো।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যদিও দলিতদের মতো আদিবাসীদের জন্যও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে, তথাপি আর্থিক বা সামাজিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন না হবার ফলে দলিত কিংবা আদিবাসী কারোই দাসত্বের অবসান হয়নি। আদিবাসী এবং দলিতেরা মিলে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। ব্যক্তিস্বাধীনতার উত্তর-পশ্চিমী তত্ত্ব যে অর্থনৈতিক কাঠামোর অসম বিন্যাসের ফলে কতখানি প্রহসনে পরিণত হতে পারে, এই এক চতুর্থাংশের দাসত্বই তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে এদেশের মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য এবং পরাধীনতারও উল্লেখ প্রয়োজন। এদেশের মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু সমাজের নীচের তলা থেকে মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। অতএব প্রথম থেকেই তারা ছিল সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে মুসলমান সমাজ বিদেশী শাসকদের সংগে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। ফলে তারা ইংরেজ শাসনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলো থেকেও স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। তাছাড়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সাধারণভাবে মুসলমানদের সর্বহারা অবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ইংরেজ সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে মুসলমানদের সবরকম আর্থিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, কারণ তারা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই শতকের প্রথম দিক থেকে আরম্ভ করে অবশ্য বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমান নেতাদের রাজনৈতিক তৎপরতায় ইন্ধন যুগিয়েছে। কিন্তু তাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কার্যত কিছুই করেনি। স্বাধীনতোত্তর যুগে এদেশের মুসলমানদের এই আর্থিক নিঃস্বতার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। জনসংখ্যার এই বৃহৎ অংশের চরম দারিদ্র্য এবং পরাধীনতাও তাই এদেশের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর একটি বিশেষ প্রতিফলন।

সাধারণভাবে বলা যায় যে এদেশের ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্যই সর্বাপেক্ষা নিদারুণ। এ শ্রেণীর কৃষক নুন দিয়ে পান্তভাত খেয়ে প্রত্যুষে

কাজে বেরোয়। সারাদিন জোতদার বা ধনী চাষীর জমিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে যা জোটে তাই খেয়ে অন্ধকার ঘরে নিদ্রার আশ্রয় নেয়। কলকাতা থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের স্ত্রী-কন্যা অবশ্য শহরে বাড়ি বাড়ি কাজ করে সামান্য অর্থ উপার্জন করে। এরা শেষ রাত্রিতে ঘুম থেকে উঠে পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে রেল ষ্টেশনে এসে কলকাতার ট্রেন ধরে। তারপর শহরে পৌঁছে আবার অনেক পথ পায়ে হেঁটে ভোর ছ'টার মধ্যে বাবুদের বাড়ি বাড়ি কাজে লেগে যায়। সারাদিন বাসন মাজা, ঘর পোঁছা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কঠিন কাজে চার-পাঁচ বাড়ি অমানুষিক পরিশ্রম করে আবার সন্ধ্যায় ট্রেন ধরে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। রাত তিনটে বাজতেই আবার পরের দিনের ব্যক্তিস্বাধীনতার ডাক আসে। আর যাদের বাসস্থান কলকাতা কিংবা অন্য কোন বড় শহরের ৪০-৫০ কিলোমিটারের মধ্যে নয়, একেবারেই গভীর গ্রামাঞ্চলে, তাদের স্ত্রী-কন্যার পক্ষে এই প্রান্তিক আর্থিক উপার্জনের সুযোগও নেই। তাদের অবহেলিত, শোষিত জীবনের এক বড় অংশ শুধু দেনার খাতায়ই লেখা থাকে। বুদ্ধিজীবি বাবুদের পাড়ায় পাড়ায় অবশ্য তবুও বেজে চলে ব্যক্তিস্বাধীনতার ঘন্টাধ্বনি।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে এদেশের শতকরা ৩৫ ভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যে সীমা বাঁধা হয়েছে খুবই নিম্নমানের দারিদ্র্যের মাপকাঠিতে। সে দারিদ্র্যসীমার অল্প উপরে যারা আছে তারাও অসংখ্য। প্রকৃতপক্ষে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সহ সমগ্র দরিদ্র জনসাধারণের সংখ্যাই এদেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিপুল। একমাত্র স্বল্পসংখ্যক শোষক শ্রেণীর মানুষকেই বিত্তবান বলা চলে। এই বিপুল দরিদ্র এবং পরাধীন জনতার মধ্যে আছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার, সারারাত পরের টাকা আর পরের খবরের বোঝা বয়েই যার দাসত্বের জীবনের অবসান। আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বিঘা জমির মালিক উপেন, যার সেই সামান্য কাঙালের ধন ধনীর হস্ত চুরি করেছে। আছে রবীন্দ্রনাথেরই কিনু গোয়ালার গলির হরিপদ কেরানী, ঢাকাই শাড়ি আর সিঁদুর পরা ইপ্সিতা যার জীবনে এলো না কোনদিন। আর আছে রাম, রহিম, বুধু, সুবল, কাদের প্রভৃতি অনেকে। যারা সকলেই আমাদের সুপরিচিত। তাদের দাসত্বের নিঃস্ব জীবনে স্বাধীনতা আসবে কি কোনদিন? কোন প্রকারে বেঁচে থাকাই যেখানে একটা বিরাট সংগ্রাম, সেখানে আত্মপ্রকাশের, আত্মবিকাশের এবং ইচ্ছাপূরণের পথ কোথায়?

উত্তর-পশ্চিমী মার্কা তাত্ত্বিকেরা অবশ্য বলবেন যে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বে প্রত্যেক মানুষেরই বিত্তবান হবার অধিকার আছে। যদি কোন মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে থাকে, তবে তা তার স্বীয় অক্ষমতা এবং অকৃতকার্যতার নির্দশন মাত্র, যার জন্যে বিত্তসঞ্চয়ে সফল মানুষকে অথবা সামগ্রিকভাবে সমাজকে দায়ী করা চলে না। তারা মূলত এই ডারউইনীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী যে সমস্ত প্রাণীজগতে এক অবিরাম প্রতিযোগিতা চলছে, এবং এই প্রতিযোগিতায় তারাই সফল হয় যারা উত্তম, আর তারাই বিফল হয় যারা অধম। কিন্তু অবমানবীয় প্রাণীদের সংগে মানুষের একটা তফাৎ এই যে মনুষ্য সমাজের একটা আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামো আছে যা একশ্রেণীর মানুষেরই রচিত এবং সে কাঠামোই বহুলাংশে ব্যক্তিমানুষের জীবনদশা নির্ণয় করে, ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণাগুণ নয়। আধুনিক যুগে সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোর মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্য এবং সংখ্যালঘু মানুষের পুঁজি জমে উঠেছে। আর বিত্তবান শ্রেণী স্বীয় বিত্তবলে এবং রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠবলে এই কাঠামোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই কাঠামোর মধ্যে বাস করে কোন ব্যক্তিবিশেষ হয়ত বা কখনও বিত্তহীন শ্রেণী থেকে বিত্তবান শ্রেণীতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিত্তহীন শ্রেণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এখানেই ব্যক্তিস্বাধীনতা তত্ত্বের চরম ব্যর্থতা।

কোন দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক কাঠামোর অসম বিন্যাসের ফলে যেমন বিত্তহীন শ্রেণীর মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে, তেমনি আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর অসম বিন্যাসের ফলে দরিদ্র শ্রেণীর দেশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে। একথা শুধু যে ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে সত্যি ছিল, তাই নয়। বর্তমান নয়া সাম্রাজ্যবাদের যুগেও প্রায় সমান ভাবে সত্যি। উত্তর-পশ্চিমের ধনতন্ত্রবাদী ধনিক রাষ্ট্রগুলি তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের দারিদ্র তথা পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাবেব সুযোগ নিয়ে তাদের কাঁচামালের জন্যে কম দাম দিচ্ছে, আর তাদের কাছে বিক্রীত শিল্পপণ্যের জন্যে চড়া দাম নিচ্ছে। নিজেদের আমদানীর উপর উচ্চ শুল্ক নির্ধারিত করে এবং অন্যান্য বাধানিষেধের মাধ্যমে, অনুন্নত দেশের পণ্য রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নিজেদের আন্তজার্তিক রাজনীতি এবং অর্থনীতির স্বার্থে ঋণদান করছে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির নীতি নির্ধারণ করছে। নিজেদের বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের আর্থিক শোষণ অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের

ঋণভারে জর্জরিত করে তাদের আন্তর্জাতিক দাসত্ব চিরস্থায়ী করতে সচেষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ এদেশে দলিত এবং আদিবাসীদের যেভাবে শোষকশ্রেণী ক্রমশ দাস শ্রেণীতে পর্যবসিত করেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি ভাবে ধনী রাষ্ট্রগুলি দরিদ্র রাষ্ট্রগুলিকে দাস রাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট। এদিকে আবার স্বাভাবিক কারণেই ধনিক রাষ্ট্রগুলির শোষক শ্রেণীর সংগে দরিদ্র রাষ্টগুলির শোষক শ্রেণীর ঘনিষ্ট আঁতাত গড়ে উঠেছে।

এখন প্রশ্ন হল, দারিদ্র্য এবং আর্থিক পরাধীনতার বাস্তব কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিকাশ সম্ভব কিনা। এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর সহজেই অনুমেয়। তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি প্রধান উপকরণ আইনের শাসনের কথাই ধরা যাক। একজন ভূমিহীন কৃষক কিংবা দিনমজুর প্রতিদিন সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোন রকমে দুমুঠো অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করে। একদিন কাজ না করলে তাকে অনাহারে থাকতে হয়। অথচ আমাদের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। জোতদার কিংবা সুদখোরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা মানে মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর ধরে আদালতে হাজিরা দেয়া, যা তার পক্ষে কদাপি সম্ভব নয়। আর এ ধরনের বিচার ব্যবস্থার ন্যূনতম ব্যয় সংকুলানও তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এদিকে বিত্তবলে বলীয়ান জোতদার-মহাজন নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে যাবে, আর অনির্দিষ্ট কাল ধরে উকিল-ব্যারিষ্টারদের মোটা দক্ষিণা এবং আদালতের অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করবে। ফৌজদারি অপরাধের জন্য অবশ্য সরকারি খরচে মামলা চালাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিত্তবানের বিপক্ষে আর বিত্তহীনদের পক্ষে সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানো কি বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব? রুটি-রুজির ধান্দা ফেলে কৃষক-মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্তের পক্ষে কি দীর্ঘকাল ধরে বার বার আদালতে হাজিরা দেয়া সম্ভব? আর পুলিশ কি আজ পর্যন্ত কোনদিন সর্বহারার পক্ষে এবং বিত্তবানের বিপক্ষে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে? বিত্তবানের সহায়তা করাই কি তাদের পক্ষে লাভজনক নয়, আর তারা কি বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বদা তাই করছে না? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ মাত্রই জানেন যে তথাকথিত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বাগ্‌বৈখরী আইনের শাসন দরিদ্র মানুষের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রহসন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বিত্তহীনের জন্য সর্বদাই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

ভোটদানের স্বাধীনতা? তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সামরিক কিংবা অন্য কোন ধরনের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ভোটদানের নামমাত্র

অধিকারও নেই। যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেখানেও ভোটদানের তাত্ত্বিক মূল্য আর বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে দুস্তর তফাৎ। প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিত্তহীন শ্রেণীর ভোটকে ছলেবলে কৌশলে প্রভাবিত করা বিত্তবান শ্রেণীর পক্ষে মোটেই দুরূহ নয়। একেই তো কৃষক-শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘুরা জোতদার-সুদখোর-বেওসায়ী এবং সমাজের কর্তাব্যক্তিদের কাছে আর্থিক ও সামাজিক কারণে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ে থাকে, যে বাধাকে বিপ্লবী চৈতন্যের মাধ্যমে অতিক্রম করা অসম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। তার ওপর মালিক শ্রেণীর কোটি কোটি কালো টাকার উপর অধিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রে বিত্তহীনদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর যুগপৎ চাপ এবং প্রলোভন সৃষ্টি করাই স্বাভাবিক রীতি। তার ওপর আবার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কেনাবেচা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অত্যাচারীর কলুষিত এবং কলংকিত বিত্তবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নির্বাচন ব্যবস্থাকে বিত্তহীন শ্রেণীর মানুষেরা বিপ্লবী চেতনা এবং সাংগঠনিক শক্তির সাহায্যে ক্ষেত্রেবিশেষে হয়ত বা সাময়িক ভাবে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কিংবা স্থায়ীভাবে এ উদ্দেশ্য সাধন প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। অর্থাৎ কেবলমাত্র ভোটদান প্রথার মাধ্যমে আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তাকে বিত্তহীন শ্রেণীর মানুষের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে ভোটদানের স্বাধীনতাকে কি অতএব প্রকৃত স্বাধীনতা বলা চলে? অথচ উত্তর-পশ্চিমী তত্ত্বে ভোটদানের স্বাধীনতাই সম্ভবত মত প্রকাশের স্বাধীনতার সবচেয়ে কার্যকর বহিঃপ্রকাশ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার অবশ্য আরও অনেক মাধ্যম আছে, যথা রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি। তাত্ত্বিক বিচারে যে কোন ব্যক্তিমানুষ সংগঠিত প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্য ছাড়াই স্বীয় প্রচেষ্টায় মত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক পৃথিবীর কোন দেশেই বৃহৎ এবং সুসংগঠিত প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্য ছাড়া কার্যকর ভাবে মতামত প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ। এদিকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে রেডিও, টেলিভিশন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্র পর্যন্ত সরকারি মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় তো বটেই, এমনকি সংসদীয় গণতন্ত্রেও এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে এই প্রচার মাধ্যমগুলি সরকারি দলের স্বার্থে, এবং বিত্তবান শ্রেণীর

স্বার্থে ব্যবহৃত হবে না। অন্যদিকে যে সব দেশে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে আছে, সেখানেও সেগুলি বিত্তবান শ্রেণীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য বিত্তহীন শ্রেণীদেরও অধিকার আছে নিজেদের মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করবার। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিত্তবান শ্রেণী কবলিত বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির অর্থবল ও পৃষ্ঠবলের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিত্তহীন অথবা নিম্নবিত্ত শ্রেণীদের পক্ষেএ ধরনের পত্রপত্রিকাকে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত দুরূহ। উপরন্তু, যে ন্যূনতম শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ স্বদেশের ও বিদেশের ঘটনা প্রবাহের সংগে পরিচিত হতে পারে, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের সম্যক পর্যালোচনা করে স্বীয় মতামত গঠন ও প্রকাশ করতে পারে, তৃতীয় বিশ্বের প্রায় কোন দেশেই আমজনতার চরম দারিদ্রের ফলে সেই ন্যূনতম জনশিক্ষা নেই। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে ধনিক শ্রেণীর স্বীয় মতামত ও আদর্শকে দেশের জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেবার স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়।

অনুরূপভাবে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও বিত্তহীন শ্রেণীর ক্ষেত্রে দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার ফলে কার্যত ব্যর্থ হয়। মৌলিক অর্থে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাই মানব সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ভবিষ্যতের দিশারি। কারণ বিবর্তনের পথে জড়জগৎ এবং অবমানবীয় প্রাণীজগৎকে উত্তরণ করে একমাত্র মানুষই মনজগতে এবং চৈতন্যলোকে বিচরণ করবার শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। এই শক্তি এবং তার ক্রমবিকাশই মানুষের স্বাধীন সত্ত্বার প্রকৃত পরিচয়। আর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিই এই উন্নত চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব দিগন্ত উন্মোচন করবার জন্য মানুষের সর্বপ্রথম প্রয়োজন চিন্তা এবং আত্মপ্রকাশের অবসর। অথচ দরিদ্র মানুষের পক্ষে সামান্য অবসর উপভোগ করাও প্রায় অসম্ভব। কারণ জীবনধারণের ন্যূনতম তাগিদগুলি মেটাতেই তাকে অহর্নিশি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সামান্যতম অবসর যদি বা জীবনে কখনো আসে, শিক্ষা, সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সেই অবসরকে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশে ব্যবহার করা আর সম্ভব হয় না কোনদিন।

শেষ পর্যন্ত বিত্তহীন শ্রেণীর যে তথাকথিত সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে বিত্তবান শ্রেণী সোৎসাহে সমর্থন করে, তা হল ধর্মীয় স্বাধীনতা। কারণ ইতিহাসের আদিকাল থেকে ধর্ম দারিদ্র্যকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সমর্থন

জানিয়েছে, বিত্তহীন শোষিত মানুষকে স্বীয় নিঃস্বতা এবং দাসত্ব ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিতে বাধ্য করেছে, আর এভাবে শোষণভিত্তিক আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোকে চিরায়ত করতে সাহায্য করেছে। বৈদিক যুগে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতা এবং যাগযজ্ঞ ভিত্তিক ধর্ম স্থানীয় জনসাধারণের উপর বহিরাগত আগ্রাসী আর্যদের আর্থিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ, কর্মফল এবং জাতিভেদের তত্ত্বের সাহায্যে মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চবর্ণের শোষক ও শাসক শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে শূদ্র নামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-শ্রমিকের উপর। *ঈশোপনিষদের* প্রথম শ্লোকেই পরিষ্কার বলা হয়েছে, ঈশ্বর সমস্ত জগৎচরাচরে বর্তমান, তিনি যা দিয়েছেন সেটুকুই ভোগ কর, অপরের ধনে লোভ করো না। *পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে এবং *মৃচ্ছকটিকা* নাটক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে অবশ্য দারিদ্র্যের অবাঞ্ছিত রূপ এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় পরম্পরায় এই জাগতিক চিন্তার কোন প্রতিফলন নেই। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে এবং পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মে দারিদ্র্যের মহিমার এই বহুশ্রুত সংলাপ বিভিন্ন ভাষায় ও ব্যঞ্জনায় বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আদি খৃষ্টধর্মেও দারিদ্র্যের মহিমা এবং জাগতিক বাসনার প্রতি ঔদাসীন্য সুকীর্তিত। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্মসংস্কারক অ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস নিজে ধনীর সন্তান হয়েও সর্বস্ব ত্যাগ করে দরিদ্রের জীবন গ্রহণ করেছিলেন এবং 'শ্রীযুক্তা দারিদ্র্যকে' (Lady Poverty) বিবাহ করেছিলেন। সেন্ট ফ্রান্সিসের এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেলেও দারিদ্র্য দুরীকরণের, এবং সেই উদ্দেশ্যে সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চৈতন্য ছিল না। তাঁর আন্দোলন দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করে প্রকৃতপক্ষে বিত্তবান শোষকশ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের পরে খৃষ্টধর্মের অভ্যন্তর থেকে ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং আরও পরে মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অভ্যুত্থানের ফলেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সপক্ষে মূলত ধর্মহীন আন্দোলন গড়ে ওঠে। ধর্মের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পর্যালোচনা করলে অতএব সহজেই বোঝা যায় যে বিত্তহীন শ্রেণীর তথাকথিত ধর্মীয় স্বাধীনতা তাদের সামগ্রিক পরাধীনতাকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে বিত্তবান শ্রেণীর আনুকূল্যে এবং পৃষ্ঠবলে রচিত একটি অলীক দর্শন মাত্র।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষত শিল্পায়ন, অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রায়শঃই এই মত উত্থাপন করা হয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা যেন ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়। অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণ যদিও আশু প্রয়োজন, তথাপি এমন পন্থায় যাতে দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা না হয়, যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে। এই মতের প্রবক্তারা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন যে দারিদ্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে একটি স্বাভাবিক মিত্রভাব আছে এবং উভয়ের সহাবস্থান সম্ভব, সহজ ও নির্বিঘ্ন। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বর্তমান থাকলে সেখানে স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং দারিদ্র্যের উচ্ছেদই স্বাধীনতার পথে প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ।

এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন দেশের বা সমাজের সামগ্রিক স্বাধীনতার অবর্তমানে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণীবিশেষ যেখানে স্বাধীন, আর সব মানুষ পরাধীন, সেখানে বাস্তবক্ষেত্রে ফলিত পরাধীনতা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা তত্ত্বের প্রহসন মাত্র। যেখানে সব মানুষের সামগ্রিক স্বাধীনতা বিদ্যমান, একমাত্র সেখানেই প্রতিটি ব্যক্তিমানুষও স্বাধীন। স্বাধীনতার এই প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলে এই সত্যও সহজেই প্রতীয়মান হয় যে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বাধীনতা শব্দটি অর্থহীন ও অবান্তর। একমাত্র সামগ্রিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। অতএব যে দেশে জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে, সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়, এবং সেই মেকি স্বাধীনতার তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণের চেষ্টাও অযৌক্তিক, বিপথগামী এবং হাস্যকর। প্রকৃতপক্ষে আমজনতার বিপুল দারিদ্র্য দূরীকরণের দ্রুততম এবং প্রকৃষ্টতম পন্থা নির্ধারণই সর্বপ্রথম প্রয়োজন, এবং মেকি ব্যক্তিস্বাধীনতার তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তথাকথিক ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্র্য দূরীকরণের তরিকায় যারা বিশ্বাসী, তারা প্রকৃতপক্ষে উত্তর-পশ্চিম দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোর মধ্যে চারশত বৎসরের শিল্পায়নের উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত এবং উদ্বুদ্ধ। ধনতান্ত্রিক দেশে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বরূপ এবং

আপেক্ষিক দারিদ্র্যের হার প্রসংগে কোন আলোচনা এখানে উত্থাপন না করেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পায়নের অন্তত প্রথম একশত বৎসরে দারিদ্র্য ও পরাধীনতা দুইই প্রবল ছিল। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের দেউলিয়া অবস্থা (Pauperism), দৈনিক ২০-২২ ঘন্টা বাধ্যতামূলক কাজের সময়, তথাকথিত কর্মশালায় (work house) নিঃস্ব মানুষদের উপর অমানুষিক অত্যাচার, খাতকের কারাগারের (Debtor's Prison) বীভৎসতা প্রভৃতি ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এবং সমকালীন সাহিত্যে সর্বজনবিদিত। আর ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণ ভোটাধিকার স্বীকৃতিলাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে জোর করে ধরে আনা লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের বেগার শ্রমের মাধ্যমে, এবং আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের ব্যাপক হারে নিধন ও বিতাড়নের মাধ্যমেই প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ অন্তত প্রথম একশত বৎসর, ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। আর সেদেশে আজও কৃষ্ণকায়, আদিবাসী প্রভৃতি জনসাধারণের এক বিপুল অংশের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্দশা সর্বজনবিদিত।

তাছাড়া বিভিন্ন কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অনুকরণ এবং পুনরাবৃত্তি করা, অথবা সেই পথে নিজেদের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করা সম্ভব নয়। প্রথমত, উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলির হাতে আর্থিক উন্নয়নের জন্য কয়েকশত বৎসর সময় নেই। তাদের দারিদ্র্য এত বিপুল ও প্রকট, এবং উন্নয়নের তাগিদ এত জরুরী, যে উত্তর-পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কয়েকশত বৎসরের আর্থিক বিকাশ তাদের কয়েক দশকের মধ্যে সাধন করতে হবে। আর্থিক বিকাশ যত সময়সাপেক্ষ হবে, দারিদ্র্যের ভার ততই গুরুতর হবে। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্মলগ্নও ততই বিলম্বিত হবে। আর সেই পরাধীনতা শুধু যে দেশের অভ্যন্তরে বিরাজমান থাকবে তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমভাবেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর ইতিহাসের জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকবে। কারণ উত্তর-পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থিক বিকাশের পথ অনুসরণ করে তারা কোনদিনই তাদের কাছাকাছিও পৌঁছোতে পারবে না। দরিদ্র দেশগুলি আর্থিক দিক থেকে কিছুটা অগ্রসর হতে হতে শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের বর্তমান স্তর থেকেও আরও অনেক বেশী এগিয়ে যাবে, আর ফলস্বরূপ উত্তর বিশ্ব আর দক্ষিণ বিশ্বের মধ্যে আর্থিক মানের পার্থক্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই

তুলনামূলক আর্থিক অনগ্রসরতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আন্তর্জাতিক স্বাধীনতাও অপহরণ করবে এবং তাদের উত্তর-পশ্চিমের নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের নাগপাশে চিরতরে বেঁধে রাখবে।

দ্বিতীয়ত, এই ঐতিহাসিক সত্য ভুললে চলবে না যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অতীতে উত্তর-পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পায়নকে সহজ ও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল। সস্তা কাঁচা মাল ও সস্তা শ্রমশক্তির উৎস এবং চড়া মূল্যের পণ্যের বাজার হিসেবে দক্ষিণ পৃথিবীর উপনিবেশগুলিকে ব্যবহার করেই উত্তর পৃথিবীর শিল্প বিপ্লব এবং দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছিল। সেই উপনিবেশগুলিই আজ তৃতীয় বিশ্ব, এবং তারা আজও আর্থিক দিক থেকে উত্তর-পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নয়া সাম্রাজ্যবাদের শিকার। এমনকি উত্তর-পশ্চিমের দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর তুলনামূলক আর্থিক স্বচ্ছলতার একটি প্রধান কারণ এই যে ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্তমান কালের নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণলব্ধ ভান্ডারের একাংশ পরোক্ষভাবে তাদের ভাগে পড়েছে। কিন্তু বর্তমানে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির চারিপাশে এমন সব উপনিবেশ নেই যাদের কাঁচা মালের উৎস এবং পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে তারা সহজেই শিল্পোন্নত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এখনও আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের শিল্পজাত পণ্য শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানী করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রয়াসে দ্রুততম পন্থায় আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই, এবং সে পন্থা উত্তর-পশ্চিমের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দরিদ্র দেশগুলি অবশ্য পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারে। কিন্তু তাদের বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি প্রায় একই ধরনের বলে, এবং তাদের অধিকাংশ আজও উত্তর-পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নাগপাশে আবদ্ধ বলে, কার্যক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। অতএব এই সিদ্ধান্ত তর্কাতীত এবং অনিবার্য যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দরিদ্র দেশগুলি মূলত অভ্যন্তরীণ জাতীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমেই যুগপৎ দারিদ্র দূরীকরণ এবং স্বাধীনতার বিকাশের সাধনা সফল করতে পারে।

তৃতীয়ত, ইউরোপের শিল্পায়নের সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদিও তুলনামূলক ভাবে দ্রুত হয়েছিল, তথাপি জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ

বিদেশে চলে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের হারকে দ্রুত করতে সাহায্য করেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে চলে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। আরও এক উল্লেখযোগ্য অংশ স্থায়ীভাবে বিদেশে বসতি স্থাপন না করলেও পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যের মধ্যে সাময়িক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে এমন কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ উগ্র জাতীয়বাদ, বর্ণবিদ্বেষ এবং রক্ষণাত্মক ও শোষণমূলক আন্তর্জাতিক আর্থিক নীতির মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলি তৃতীয় বিশ্ব থেকে স্থায়ীভাবে জনপ্রবেশ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে জনসংখ্যার তীব্র সমস্যা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির সামনে শুধুমাত্র নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে উন্নয়ন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

চতুর্থত, শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রায় সবই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। এই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের কর্মশক্তি, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন প্রভৃতির সহায়ক। শিল্প বিপ্লবের সময় যখন কুটীর শিল্পের জায়গায় ভারী যন্ত্রপাতি ভিত্তিক কারখানার প্রবর্তন হলো, তখন সেই নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য শ্রমশক্তির অধিকতর এবং নিবিড় প্রয়োগেরও প্রয়োজন হলো। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এই নূতন পরিস্থিতির সহায়ক ছিল। অপরপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় সবই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত। এই জলবায়ু কায়িক শ্রম, কৃষি ও শিল্পোৎপাদন প্রভৃতির পরিপন্থী। দক্ষিণ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের পথে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বাধা, উত্তর পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলিকে কোনদিন যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

পরিশেষে উল্লেখ্য, যে ধনতান্ত্রিক পন্থায় উত্তর-পশ্চিমী দেশগুলির আর্থিক উন্নতি হয়েছে, তাতে উন্নতি আরম্ভ হয় সমাজের উপরতলা থেকে। বিত্তবান ব্যবসায়ী কিংবা সামন্ত শ্রেণী শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে ক্রমশ অধিকতর বিত্তবান হতে থাকে, একচেটিয়া ধনতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত বিত্তহীন শ্রেণীর ভাগে উন্নয়নের এক সামান্য অংশ এসে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিপুল সহায়তা সত্ত্বেও উত্তর-পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর আপেক্ষিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে কয়েকশত বৎসর লেগেছে। এ পন্থা অবশ্যই জনসাধারণের অধিকাংশের স্বাধীনতা ও সাম্যের

পরিপন্থী, অতএব নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির কাছে বর্জনীয়। আর এই দীর্ঘমেয়াদী পন্থা তাদের বিপুল দারিদ্র দূরীকরণের দ্রুততম পন্থা হিসেবেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দরিদ্র মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনগুলির পূরণই স্বাধীনতার প্রথম সোপান। অতএব এ প্রয়োজনগুলি সর্বপ্রথম মেটাবার প্রতিশ্রুতি যে উন্নয়নের পদ্ধতি বহন করে, একমাত্র সে পদ্ধতিই দরিদ্র দেশগুলির কাছে নৈতিক আদর্শ তথা বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য। আর সে প্রতিশ্রুতির দায়ভার একমাত্র সমাজতন্ত্রই বহন করতে সক্ষম।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সমগ্র জনশক্তিকে সংহত এবং সুপরিকল্পিত ভাবে নিয়োগ করাই একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা। একমাত্র এই পন্থার মাধ্যমেই যুগপৎ জনসাধারণের সামগ্রিক কর্মশক্তি ও সৃজনীশক্তির বিকাশ এবং দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের বুনিয়াদ রচিত হতে পারে। কিন্তু জনশক্তির এহেন সংহতি সাধন করতে হলে তাদের মধ্যে দেশের উন্নতিতে আত্মনিয়োগের জন্য উদ্দীপনা সঞ্চারের বিশেষ প্রয়োজন। অসম আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর বন্ধনশৃংখলে আবদ্ধ থাকলে তাদের মধ্যে সে উদ্দীপনা আশা করা যায় না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমেই গণউদ্দীপনার সঞ্চার এবং গণশক্তির সংহতি সম্ভব। অর্থাৎ যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অংগীকার ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে এবং অন্যত্র ছড়িয়ে রয়েছে, সেই আদর্শকে ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের সব দেশে কার্যক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রূপদান করতে না পারলে জনশক্তির সংহতি ও সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হবে না।

শুধুমাত্র দরিদ্র দেশগুলির আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ধনতান্ত্রিক আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থলে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বুনিয়াদ রচনা করলেই জনশক্তির সংহতি, দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা সামগ্রিক স্বাধীনতার বিকাশ সম্ভব হবে না। সুপরিকল্পিত ভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে, তথা বিকেন্দ্রিত ভাবে গণসংগঠনের মাধ্যমে, গণশক্তির উৎপাদনমুখী সামাজিক বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রযুক্তি এবং প্রয়াসও অপরিহার্য। কারণ শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আমলাতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে এ ধরনের সামগ্রিক গণসংহতি ও গণপ্রচেষ্টা কদাপি সম্ভব নয়।

একথা স্মরণ রাখলেই সুবুদ্ধির পরিচয় হবে যে স্বাধীনতা একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। দেশকাল নিরপেক্ষ, কপোলকল্পিত এবং মহাশূন্যে ভাসমান

কোন আধিবিদ্যক তত্ত্ব নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধনিক শ্রেণী ও দরিদ্র শ্রেণীর স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীন মানুষের স্বার্থে মুষ্টিমেয় বিত্তবান অথবা সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপ্রসূত ভ্রান্ত চেতনাসম্পন্ন মানুষের তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা সামগ্রিক স্বাধীনতার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। দরিদ্র মানুষের মুক্তির আর কোন বিকল্প পথ নেই।

উন্নয়নের সামগ্রিক প্রয়াসের কালে কায়িক শ্রমের বিশেষ গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধীশক্তিশ্রমের উচ্চ মূল্যায়ন এবং কায়িক শ্রমের নিম্ন মূল্যায়ন কালোপযোগী নয়। কিন্তু অভাবজনিত কঠোর কায়িক শ্রম মানব জীবনের আদর্শ লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ সে শ্রম মানুষকে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ রেখে তার ধীশক্তি এবং সংস্কৃতির বিকাশকে প্রতিহত করে। একমাত্র অত্যধিক কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত মানুষই সেই সময় এবং ভাবনার রাজ্যে বিচরণ করতে পারে, যেখানে তার ধীশক্তি এবং সাংস্কৃতিক সৃজনীশক্তির বিকাশ সম্ভব, যে বিকাশ মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাধীনতার প্রকৃত অভিব্যক্তি। এহেন সময়, সুযোগ এ স্বাধীনতা সৃষ্টি করতে হলে যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করে ক্রমশ উৎপাদনজনিত কায়িক শ্রম কমিয়ে আনা অবশ্য প্রয়োজন। অর্থাৎ মানব স্বাধীনতার বিকাশের সংগে প্রযুক্তি ও যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির কার্যকারণ সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এদিক থেকে বিচার করলে যে সব স্বদেশী ও বিদেশী জ্ঞানীগুণীরা এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে সর্বোন্নত প্রযুক্তি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর, এবং এসব দেশের পক্ষে ক্ষুদ্র কিংবা মধ্যম প্রযুক্তিই উপযুক্ত, তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই মতবাদ গৃহীত হলে দেশের জনসাধারণের সামগ্রিক মুক্তি এবং দরিদ্র দেশগুলির আন্তর্জাতিক মুক্তি কদাপি সম্ভব নয়। কারণ এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে দারিদ্র এবং উৎপাদনজনিত কঠোর কায়িক শ্রম, তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলির কাছে পরাধীনতা অবশ্যই চিরায়ত হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তন অথবা অটোমেশন সামগ্রিক ভাবে বেকারত্বের সৃষ্টি করে না এবং আজ পর্যন্ত কোন দেশে তা করেনি। এ ধরনের প্রযুক্তির বিকাশের ফলে যদি বেকারত্বের সৃষ্টি হত, তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত প্রযুক্তিশীল দেশগুলিতে আজ অধিকাংশ মানুষই বেকার হয়ে পড়তো। প্রকৃতপক্ষে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

এবং পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন সমীক্ষায় অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে অটোমেশনের ফলে চাকুরির সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধি পায়। যা ঘটে তা হল কায়িক শ্রমের ধীশক্তিশ্রমে রূপান্তর। এই রূপান্তরের পথ নিয়ন্ত্রণহীন হলে স্থানীয় ভাবে এবং সাময়িক ভাবে কিছু কিছু বেকারত্বের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সুপরিকল্পিত ভাবে এই রূপান্তর সংঘটিত হলে সে সম্ভাবনাও থাকে না। গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুর কায়িক শ্রম প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতেও দক্ষিণ পৃথিবীর দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অটোমেশন প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন। অবিরাম উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমেই মানব সমাজের স্বাধীনতার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ সম্ভব।

মানব সমাজের ধীশক্তি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রসঙ্গে পরিশেষে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো রচনা এবং গণশক্তির সংহত বিনিয়োগের মাধ্যমে, এমনকি প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমেও এ ধরনের স্বাধীনতার পূর্ণ সুরক্ষা এবং বিকাশ সম্ভব নয়। একথা ধ্রুব সত্য যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো মানব সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মুক্তির অপরিহার্য বুনিয়াদ। এ বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে গণশক্তির সংহতি এবং উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের কর্মশক্তি এবং সৃজনীশক্তি বিকশিত হয়। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে এভাবে অবিরাম পরিবর্তিত করবার মাধ্যমে স্বাধীনতার বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিকাশের জন্য সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা অবশ্য প্রয়োজন। শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সহ দেশ, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতিটি আংগিক, সমস্যা এবং বিষয় সম্বন্ধে, তথা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিকল্প তত্ত্ব, মতবাদ এবং আদর্শ রচনা ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা বর্তমান না থাকলে দারিদ্র্যের বন্ধনমুক্ত হলেও মানব সভ্যতায় স্বাধীনতার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

৩

সমাজ সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা

সচরাচর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বাধীনতাতত্ত্বের আলোচনা যেভাবে করে থাকেন তাতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিশেষ কোন স্থান নেই। এক দিকে সমাজের সামগ্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সংঘাত এবং আরেক দিকে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সংঘাত—মোটামুটি এই নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে স্বাধীনতা-তত্ত্বের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ এবং ব্যক্তির সম্বন্ধ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরাও বিশেষ আলোচনা করেন না, তাঁদের আলোচনা সাধারণত সমাজ এবং ব্যক্তির পারস্পরিক আদানপ্রদান, প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির তুলনামূলক অবহেলার প্রধান কারণ এই যে ইউরোপে স্বাধীনতা-বিষয়ক চিন্তাধারা প্রধানত রিফরমেশন অথবা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সফল পরিণতির পরে উদ্ভূত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই গড়ে উঠেছিল। আর সেই পরিস্থিতির একটি আঙ্গিক ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সমাজের ধর্মীয় স্বাধীনতার সংঘাত এবং বিকাশশীল ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের সংঘাত। সামগ্রিকভাবে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের স্বাধীনতার সংঘাত এই ঐতিহাসিক পটভূমির অঙ্গীভূত ছিল না। উত্তর-পশ্চিমী স্বাধীনতা-তত্ত্বের প্রধান ভাষ্যকার জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত তাঁর *লিবার্টি* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এক ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর প্রতি অপর ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর সহিষ্ণুতার উদাহরণ মাত্র। সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার তত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনা এমনকি জন স্টুয়ার্ট মিলও করেন নি।

উত্তর-পশ্চিমী শিক্ষা এবং ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয় চিন্তকেরাও সমাজের কাঠামো এবং বিন্যাসের সঙ্গে মানব স্বাধীনতার সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ চিন্তার পরিচয় রাখেন নি। আধুনিক যুগে অনেক উত্তর-পশ্চিমী তাত্ত্বিকের মতো ভারতীয় তাত্ত্বিকেরাও মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন যে এদেশে প্রাচীন কাল থেকেই উচ্চমানের সামাজিক স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল, এবং আজও সে স্বাধীনতা বর্তমান আছে। এই তত্ত্বের পেছনে যুক্তি এই যে, প্রাচীন কাল থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এদেশে এক ধরনের গ্রামস্বরাজ চালু ছিল, আর মোগল-পাঠান-ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী শাসকেরা কেউই ভারতীয় সমাজের কাঠামো, ধর্ম এবং সংস্কৃতি, তথা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নি বলে এই সামগ্রিক সামাজিক স্বাধীনতা আধুনিক যুগ পর্যন্ত অটুট ছিল। এই যুক্তি থেকে প্রায়ই এই সিদ্ধান্তও করা হয়ে থাকে যে, বিদেশী শাসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে এদেশের মানুষের রাজনৈতিক শক্তি হরণ করলেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের মানুষের সামাজিক স্বাধীনতা তথা তাদের বিকেন্দ্রিত এবং মৌলিক স্বশাসন, বহুশত বৎসরের বিদেশী আগ্রাসন এবং শোষণ-শাসন সত্ত্বেও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছে। ফলে আমাদের নীচের তলার রাজনৈতিক স্বাধীনতাও প্রকৃতপক্ষে অক্ষুন্নই ছিল। স্বাধীন ভারতেও সবকারি নীতি পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, সামাজিক কাঠামোয় হস্তক্ষেপ না করা এবং ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার উপর অধিষ্ঠিত রয়েছে বলে একাধারে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের বিকেন্দ্রিত স্বাধীনতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এ ধরনের চিন্তাধারার একটি মৌলিক দুর্বলতা এই যে, এখানে সমাজকে একটি অবিভক্ত সত্তা হিসেবে ধরা হয় এবং সব মানুষকে সমমর্যাদার একক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু যে কোন দেশের মানুষেরাই একটা আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাস করে এবং সে কাঠামোর বিন্যাসের উপর তাদের স্বাধীনতার বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী আর্থসামাজিক কাঠামোকে নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এমন এক সংস্কৃতি সৃষ্টি করে যা তাদের স্বার্থের অনুকুল আর্থসামাজিক কাঠামোকে চিরায়ত করতে সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে আর্থিক কাঠামো আগে, না সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো আগে, সে দার্শনিক প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ এবং তার আর্থিক কাঠামো অবশ্যই তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর মৌলিক উপাদান।

কিন্তু সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো একবার সৃষ্ট হলে তা আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত বিকাশকে প্রতিহত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারে এবং জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার প্রতিকূল কিংবা অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। এখানেই কোন দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সে দেশের মানুষের স্বাধীনতার গভীর যোগসূত্র বর্তমান। আর এ যোগসূত্রকে গুরুত্ব না দেয়াই উত্তর-পশ্চিমী স্বাধীনতা চিন্তার গুরুতর ব্যর্থতা। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও উত্তর-পশ্চিমী চিন্তানায়কদের মধ্যে বিভাজ্য সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের প্রবক্তারা (প্লুরালিস্ট) রাষ্ট্রের আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজকে মুক্ত করবার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের আধিপত্যের ফলে যে বৃহত্তর অংশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে, অথবা দেশের সাংস্কৃতিক কাঠামো যে সমাজের আংশিক কিংবা সামগ্রিক স্বাধীনতাকে প্রতিহত করতে পারে, এ চিন্তা উত্তর-পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের এবং তাদের এদেশীয় অনুগামীদের মস্তিষ্কে বিশেষ স্থান পায়নি। অথচ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো যে ইতিহাসে বারবার মানব স্বাধীনতার বিকাশকে বিলম্বিত করেছে তার অসংখ্য নজির বর্তমান।

উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই ভারতের সামাজিক কাঠামোর উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে যে বর্ণভেদের কাঠামোর উপর সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তা শ্রেণীভেদেরই আদিম রূপ বিশেষ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন সংখ্যাল্প শ্রেণী উৎপাদনে কোনই অংশ গ্রহণ করত না, এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রদের দিয়ে সমস্ত কায়িক শ্রম এবং উৎপাদন করাত। অর্থাৎ প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী আর্থিক দিক থেকে পরগাছা হলেও আর্থসামাজিক কাঠামোকে তারাই নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করত। বৈশ্যের অর্থবল, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল আর ব্রাহ্মণের বুদ্ধিবলের সমন্বয়ে এই ক্ষুদ্র পরগাছা কুল শূদ্র নামধারী বিপুলসংখ্যক খেটেখাওয়া মানুষকে শত শত বৎসর ধরে শোষণ আর শাসন করত। এভাবে সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আর্থিক তথা সামাজিক স্বাধীনতা এক মুষ্টিমেয় পরগাছা শ্রেণী হরণ করে নিত। আর এ সবই হয়েছে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী। এই অসম এবং স্বৈরাচারী সমাজব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানত সংখ্যালঘু শোষক শ্রেণীর আর্থিক স্বার্থে গঠিত হলেও, ব্রাহ্মণদের সাহায্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা ক্রমশ এমন এক সমাজদর্শন এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো রচনা করে, যা তাদের কায়েমি স্বার্থকে চিরায়ত করতে পারবে। শোষণকে চিরস্থায়ী করতে হলে চাই শোষকের চিরস্থায়ী শাসন, আর

এই শাসনকে চিরস্থায়ী করতে হলে প্রয়োজন এমন এক তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই অসম এবং শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকেই মনে করতে শিখবে স্বাভাবিক এবং যুক্তিনির্ভর। আর ঠিক এ ধরনের সাংস্কৃতিক আদর্শ রচনার কাজই ব্রাহ্মণেরা করেছিলেন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং তাদের পৃষ্ঠবলের সাহায্যে। ব্রাহ্মণদের রচিত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থে তাই লেখা আছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রেরা সমস্ত কায়িক শ্রম করবে এবং অন্য তিন বর্ণের মানুষের সব রকম সেবা করবে। সনাতন ধর্মের এই নির্দেশ।

গ্রীস, রোম প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও প্রাচীন কালে এ ধরনের শোষণমূলক আদিম শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো সেখানে ধর্মভিত্তিক সাংস্কৃতিক আদর্শের আড়ালে সে শ্রমবিভাজনকে বংশানুক্রমিক করা হয়নি। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর তাত্ত্বিক ভূমিকা এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল এবং তাদের সামনে রেখে ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরা এমন একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ সফল এবং কার্যকর ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পেরেছিল যে কালক্রমে শোষিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রশ্রেণীসহ সমগ্র জনসাধারণই এই আদর্শকে স্বাভাবিক, ধর্মভিত্তিক এবং যুক্তিনির্ভর বলে মেনে নিয়েছিল। অস্পৃশ্য নামক উপশ্রেণীসহ সমগ্র শূদ্রশ্রেণীর বিন্দুমাত্র পেশাগত এবং জীবিকা সংক্রান্ত স্বাধীনতা ছিল না। এই দরিদ্রতম শ্রেণীর পক্ষে আয়ের দিক থেকে নিম্নতম এবং নিকৃষ্ট কর্মগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার এবং সামগ্রিকভাবে তাদের ক্রীতদাসসুলভ কাঠামোগত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায়ই শোষক শ্রেণীর মুখপাত্র শাস্ত্রকারেরা নির্দেশ করে নি। তাদের জন্য মানবতাধর্মী কোন বিচার ব্যবস্থাও ছিল না। কারণ সব শাস্ত্রকারেরা একবাক্যে শূদ্রদের জন্য লঘু অপরাধে গুরুদন্ড আর অন্য শ্রেণীদের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের জন্য গুরু অপরাধে লঘু দন্ডের ব্যবস্থা দিয়েছিল। এমনকি ধর্মীয় সোপান ধরেও শূদ্রদের পক্ষে তাদের আর্থিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাদের পক্ষে ধর্মচর্চা তথা যে কোন প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ইহজন্মে কায়মনোবাক্যে অপর তিন শ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন সেবা করলে পরজন্মে তাদের পক্ষে উন্নত শ্রেণীতে উত্তরণ সম্ভব এবং তখন তারা ধর্মচর্চা এবং বিদ্যাশিক্ষার অধিকার পাবে—এই ছিল শাস্ত্রকারদের সুস্পষ্ট নির্দেশ। ইহজন্মে অতএব তাদের মানবিক স্বাধীনতা লাভের কোন উপায়ই সমাজ নির্দেশ করেনি। অথচ এই সার্বিক দূর্দশা এবং পশুর জীবন থেকে মুক্তি

পাবার জন্য শূদ্রশ্রেণীর কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ কিংবা সংগ্রামের ঘটনা প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে নেই, যদিও তুলনীয় বিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যে এবং পরবর্তী কালের ইউরোপে বারবার ঘটেছে। কারণ এদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর নিয়ন্তারা এমন একটি সাংস্কৃতিক আদর্শকে সমগ্র জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা ছিল প্রথমোক্ত কাঠামোর পরিপূরক। অর্থাৎ আর্থসামাজিক অবকাঠামোর অনুকূল একটি সাংস্কৃতিক উপকাঠামোও সৃষ্ট হয়েছিল, এবং কালক্রমে সেই সাংস্কৃতিক উপকাঠামোই গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের স্বাধীনতার বিকাশ, এমনকি স্বাধীনতা চেতনার বিকাশের পথেও বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অতএব এই সত্যও সহজেই প্রতীয়মান হবে যে এদেশের সনাতন পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব স্বাধীনতার বিকাশ কোন কালেই সম্ভব ছিল না। কারণ পঞ্চায়েত প্রথা দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শাসনব্যবস্থা ছিল না এবং এখনও নেই, যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও আদিম এবং বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর শাসন এবং তাদের পক্ষে রচিত ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে গ্রামপঞ্চায়েতগুলি এই শোষণশাসনের সাংগঠনিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হত এবং এরকম অসংখ্য গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমেই এদেশের মানব স্বাধীনতার পরিপন্থী আর্থসামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো চিরায়ত হত।

প্রযুক্তির বিকাশ, শিল্পায়ন, এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বর্ণভেদপ্রথায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত, বহুপল্লবিত জাতিভেদ প্রথার অভ্যন্তরে সহস্র সহস্র তথাকথিত জাতির উৎপত্তির ফলে জন্মগত পেশার বন্ধন অনেক ক্ষেত্রেই শিথিল হয়েছে। কিন্তু উচ্চনীচ মূল্যায়নের উপর প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শূদ্রের হীনত্বের তত্ত্ব আজও এদেশে সর্বজনস্বীকৃত। আর তথাকথিত অস্পৃশ্য অথবা দলিত সহ শূদ্রশ্রেণী আজও সংখ্যালঘু আর্থসামাজিক শ্রেণীর শোষণশাসনের বিরুদ্ধে কোন সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নি, এমনকি এ ধরনের কোন ব্যাপক স্বাধীনতা চৈতন্যেরও পরিচয় দেয়নি। আর এহেন অপসাংস্কৃতিক কাঠামোকে ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র' আর

'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আদিতে সাংস্কৃতিক কাঠামো আর্থসামাজিক কাঠামোর উপকাঠামো হিসেবে জন্মলাভ করে থাকলেও ক্রমে তা এক স্থিতিশীলতা এবং দুর্মরতা অর্জন করতে পেরেছে, যা নাকি অনেকখানিই স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বয়ংচালিত এবং স্বনির্ভর।

এদেশের এই স্বৈরাচারী এবং শোষণমূলক সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কাঠামো মানব স্বাধীনতাকে বহুভাবে বিঘ্নিত এবং প্রতিহত করেছে। প্রথমত, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শোষিত এবং নিপীড়িত দাসসুলভ জীবন যাপন করত বলে এবং তাদের কর্মকাজ জন্মগতভাবে নির্দিষ্ট ছিল বলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কোন দায়িত্ববোধ ছিল না। শাসনকার্য ও যুদ্ধবিগ্রহ রাজার এবং ক্ষত্রিয়শ্রেণীর কর্ম—এই ছিল ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন। ফলস্বরূপ উপর্যুপরি বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এদেশের আমজনতা কোনদিন তৎপর হয়নি। মেগাস্থিনিস বলেছেন যে তিনি দেখেছেন, রাজপথে দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে, আর অনতিদূরে কৃষকেরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কৃষিকার্য করছে। কারণ বংশপরম্পরায় তারা এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছে যে ক্ষত্রিয়দের কাজ যুদ্ধ করা আর শূদ্রদের কাজ জমি চাষ করা। এভাবে বারবার দেশের মানুষের সামগ্রিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমতা বিঘ্নিত হয়েছে এবং আমরা প্রায় বিনা প্রতিরোধে বিদেশী আগ্রাসনের শিকার হয়েছি। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অশিক্ষা-কুশিক্ষার শিকার বানিয়ে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী দেশের মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে আর এভাবে তাদের স্বাধীনতা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সম্ভাবনাকে স্তব্ধ করে রেখেছে। তৃতীয়ত, বর্ণভেদ-জাতিভেদের সারি সারি লৌহপ্রাকারে বিভক্ত এবং বংশানুক্রমিক পেশার লৌহবন্ধনে আবদ্ধ সমাজে নূতন নূতন প্রযুক্তির উন্মেষ এবং শ্রমের সঞ্চারণশীলতা আদৌ সম্ভব ছিল না। অথচ এই দুই উপকরণের অভাবে কোন দেশের দ্রুত আর্থিক বিকাশ সম্ভব নয়। এভাবেই এদেশের দারিদ্র্য চিরায়ত হয়েছে, এবং দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী বিভীষিকার মধ্যে এদেশের মানুষ আত্মবিকাশ এবং আত্মপ্রকাশের সব রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে আর্থিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক—কোন ধরনের স্বাধীনতার মুখই এদেশের আমজনতা দেখতে পায় নি। পরিশেষে উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরে একাধারে দারিদ্র্য এবং জনসংহতির অভাববশত, এবং শাসকশ্রেণীর পেছনে গণশক্তির সমর্থন না থাকবার ফলে, ভারতবর্ষ এমনকি বর্তমান কালেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন

করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অধিকতর শক্তিশালী বিদেশী শক্তির চাপে দেশের সামগ্রিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কাঠামোতে নারীর স্থানও স্বাধীনতা হরণের আরেকটি বড়ো উদাহরণ। বৈদিক যুগে সম্ভবত সমাজে নারীর স্থান ততটা হীন ছিল না। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের যুগ থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই আর্থিক তথা সামাজিক দিক থেকে নারীর স্থান শূদ্রদের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র এবং পরিবারের অবৈতনিক দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হত। আর প্রাচীন এবং মধ্য যুগে জমির তুলনায় লোকসংখ্যা কম ছিল বলে অধিক পুত্রসন্তানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র পুত্রসন্তান উৎপাদনের কোন উপায় ছিল না বলে প্রকৃতপক্ষে বহু সন্তানের জননী হওয়া ছাড়া নারীর গত্যন্তর ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে নারীর যত কম বয়সে বিবাহ হত, ততই সে ছিল আর্থিক দিক থেকে লাভদায়ক। প্রথমত, বাল্যবিবাহে পিতৃপক্ষের ব্যয় লাঘব হত, কারণ পিতৃগৃহে কন্যার ভরণপোষণের সময়কাল এর দ্বারা সংকুচিত হত। একই কারণে, নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হত, কারণ এভাবে তার শিক্ষার ব্যয় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত। তারপর ঋতুমতী হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সহবাস করতে আরম্ভ করলে বহু সন্তান লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হত। স্বামীর পরিবারের অবৈতনিক দাসী হিসেবেও তার কার্যকালের মেয়াদ দীর্ঘ হত। একই আর্থিক কারণে সহমরণ অথবা সতীদাহ এবং বিধবাদের বিবাহনিষেধ আর তাদের দুঃসহ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা ছিল। সতীদাহের ফলে একই সঙ্গে বিধবা নারীর ভরণপোষণের ব্যয়ভার থেকে মুক্তি এবং মৃত স্বামীর ও সদ্যবিধবার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করা সম্ভব হত। আর যেসব বিধবা নারী এ প্রথার শিকার না হয়ে কোনক্রমে বেঁচে থাকত তাদের মস্তক মুন্ডন করে এবং স্বল্পতম ব্যয়ের আহার আর পরিচ্ছদ দিয়ে তার বদলে যৌথ পরিবারের অবৈতনিক দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য করা হত। আর এ সব অধার্মিক এবং অমানবিক কাজই করা হতো তথাকথিত ধর্মের নামে। শিল্পায়ন এবং নারীশিক্ষার বিস্তারের ফলে ভারতের শহরাঞ্চলে নারীজাতির এই শোষণের কাঠামো কিঞ্চিৎ শিথিল হলেও দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে তাদের সামগ্রিক শোষণ-শাসন আজও অব্যাহত আছে। ক্যাথারিন মেয়োর *মাদার ইনডিয়া* নামক গবেষণাগ্রন্থে, এবং আশাপূর্ণা দেবীর *প্রথম প্রতিশ্রুতি* ও *সুবর্ণলতা* — এই দুটি উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে নারীর

স্থান সম্বন্ধে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ।

শ্রেণীভেদ-জাতিভেদের ক্ষেত্রে যেমন শোষকশ্রেণী আর্থসামাজিক কাঠামোকে চিরায়ত করবার উদ্দেশ্যে তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, নারী-শোষণ ও নির্যাতনের ক্ষেত্রেও তারা ঠিক তাই করেছিল। সে কারণেই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর হীনস্থান নির্দেশক বাগ্‌বৈখরী তত্ত্বজাল বিস্তার আর অসংখ্য অনুশাসন। মনু বলেছেন, সারা জীবনে নারীর কখনও কোন স্বাধীনতা নেই। নারী শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিভিন্ন নায়কের আদেশ অনুযায়ী নারীকে বিনা প্রতিবাদে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মনুর আরও বিধান, কন্যার পিতা অথবা ভ্রাতা তাকে যে পাত্রের হাতে সমর্পণ করবেন, তাকেই নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে হবে এবং দেবতাজ্ঞানে আজীবন ভক্তি আর সেবা করতে হবে। স্বামী যদি মাতাল, দুশ্চরিত্র, লম্পট, লোলচর্ম বৃদ্ধ, অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হন, তথাপি তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে, দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে হবে, এবং তাঁর জন্য সব রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে। প্রতিটি নারীকে ভারি কায়িক শ্রমসাপেক্ষ কাজসহ যাবতীয় গৃহকর্মে পারদর্শিনী হতে হবে। শূদ্রের মতো নারীরও বিদ্যাশিক্ষা অথবা ধর্মচর্চার কোন অধিকার থাকবে না। পতির পুণ্যেই সতীর পুণ্য মনে করতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছেন, বিবাহের পূর্বে কন্যা যতবার ঋতুমতী হবে ততবার তার পিতার মহাপাতক হবে। সব শাস্ত্রকারেরাই একদিকে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের অনুশাসন দিয়েছেন, আর অন্যদিকে পুরুষের বহুবিবাহ এবং নারীর একবিবাহের পক্ষে নির্দেশ দিয়েছেন। সীতা, সাবিত্রী, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, শৈব্যা প্রভৃতির পৌরাণিক কল্পকাহিনী অবলম্বনেও একই সাংস্কৃতিক আদর্শকে জনমানসের গহনে দৃঢ়মূল করবার চেষ্টা হয়েছে। আর এক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক কাঠামো ক্রমশ এতখানি স্থিরত্ব লাভ করেছে যে আর্থসামাজিক কাঠামোয় বর্তমান কালে কিছুটা পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই সাংস্কৃতিক কাঠামো আজও এদেশের বুকে প্রায় অচল হয়ে বসে আছে।

নারী একটি শ্রেণী নয়, সমাজের সব শ্রেণীরই অর্ধেক অংশ। কিন্তু সব শ্রেণীতেই তাদের শূদ্রতুল্য দাসীসুলভ অবস্থা প্রায় সমান। অশিক্ষা-কুশিক্ষার শিকার, কঠোর কায়িক শ্রম এবং দাসীত্বের কারাগারে আবদ্ধ, দুর্বলতর শ্রেণীর নারীদের মনে তো স্বাধীনতার চেতনা বা চিন্তারই কোন উন্মেষ হয় নি।

আত্মবিকাশ, আত্মপ্রকাশ, সৃজনশীল কর্মধারা এবং ইচ্ছাপূরণ তো দূরের কথা। এমনকি মধ্যবিত্ত সমাজজীবনেও নারীর অবস্থা দাসীত্বের অবস্থা থেকে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ তাই আক্ষেপ করেছেন, দশের ইচ্ছে বোঝাই করা নিরলস পরিশ্রমের এই জীবনে মধ্যবিত্ত নারী তার নিজের জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ কিংবা যাহোক একটা কিছু—এই সামান্য কথাটা ভেবে দেখবারই সময় পেল না কোনদিন। স্বীয় মহীয়সী শক্তি এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে কবি তাই তাকে চৈতন্য দিয়েছেন তার জীবনে নয়, শুধু মরণের মুখে, জীবনশেষের শেষ জাগরণের মুহূর্তে।

শূদ্রশ্রেণীর এবং নারীদের উল্লিখিত উদাহরণ দুটি এদেশের আর্থসামাজিক কাঠামো এবং তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক কাঠামোর দুটি প্রধান আঙ্গিক মাত্র। সামগ্রিক চিত্র আরও ভয়াবহ এবং এদেশে স্বাধীনতার বিকাশের পথে বিপুল বাধাস্বরূপ। কিন্তু এদেশের শোষক শ্রেণী দার্শনিক স্তরে তত্ত্বজাল বিস্তারের মাধ্যমে আরও একটি সূক্ষ্মতর সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরি করেছে যার প্রভাব ব্যাপকতর এবং গভীরতর অর্থে স্বাধীনতা চেতনার বিকাশের পরিপন্থী। ভারতের ষড়দর্শনের প্রবক্তাদের মধ্যে বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে মতভেদ থাকলেও কয়েকটি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁরা একমত, আর এই তত্ত্বগুলিই সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। এই সর্ববাদীসম্মত তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রধান হল জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ, অদৃষ্টবাদ এবং জগদ্বিমুখতা। এই তত্ত্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং পরস্পরের উপর কাঠামোগত ভাবে নির্ভরশীল। এদের মূল বক্তব্যগুলির সারমর্ম নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যেতে পারে। ইহজন্মে মানুষের জীবনদশা তার পূর্বজন্মের কর্মফল দ্বারা অনিবার্য এবং অমোঘ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। পুরুষকার দ্বারা অতএব এর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এরা সবাই পূর্বজন্মের কর্মফলেই এই জীবনের বর্ণ অথবা জাতিতে জন্মেছে এবং এই অবস্থার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে ধনী এবং দরিদ্র, রাজা এবং প্রজা পূর্বজন্মের কর্মফলেই এজন্মে নিজ নিজ স্থান এবং আর্থসামাজিক পরিস্থিতি অর্জন করেছে এবং এই ঘটনার পরিবর্তন অসম্ভব। কোন মানুষ তার এই জন্মে লব্ধ জীবনদশার উন্নতি কিংবা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হলে কর্মফলের অমোঘ নিয়মে তার সে প্রয়াস প্রতিহত হবে। উপরন্তু, কর্মফলরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অমোঘ নৈতিক বিধানের বিরোধিতা করবার ফলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে আরও অধঃপতিত হবে। অতএব বর্তমান জীবনের দশা-অন্তর্দশা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, এবং এটাই ধর্ম।

ঈশাবাস্যোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে যে ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত, তিনি যেটুকু তোমাকে দিয়েছেন সেটুকু ভোগ করেই সন্তুষ্ট থাকো, অপরের ধনে লোভ করো না। পূর্বজন্মের কর্মফল সুনির্দিষ্ট, অতএব একমাত্র সমাজনির্দিষ্ট কর্তব্য এবং দায়দায়িত্ব ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন মোতাবেক যথাযথ পালন করলে তবেই পরজন্মে কিছুটা উন্নততর দশার আশা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন করবার চেষ্টা অথবা দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনদশার উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত কিংবা সংঘবদ্ধ চেষ্টা অধর্মেরই নামান্তর। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ীই বর্তমান জীবনদশা লাভ করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই নৈতিক বিধানে হস্তক্ষেপ করা কোন মানুষেরই উচিত নয়। তৃতীয়ত, ইহজগৎ মরণশীল এবং দুঃখময়। বেদান্তবাদীরা বলবেন জগৎ মায়াস্বরূপ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। অতএব মানব জীবনের কোন জাগতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। জাগতিক সুখের বাসনা শুধুমাত্র অবিদ্যার ফল। তেমনি ভাবে শরীর মরণশীল, দুঃখময় এবং মিথ্যা। আত্মা অমর, আনন্দময় এবং সত্য। মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পৃথিবীর জন্মমৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মার পরমাত্মাতে লয়, অথবা মোক্ষ কিংবা নির্বাণ লাভ। সমগ্র বিশ্বচরাচরের এই নৈতিক বিধানের মধ্যে ঐশী শক্তি অথবা অদৃষ্টই প্রবল, পুরুষকার অবাস্তব, মূল্যহীন এবং অবিদ্যাপ্রসূত মরীচিকা বিশেষ। জগতের বাস্তবতা এবং জাগতিক সুখের অবিদ্যা দূর করবার জন্য এবং এভাবে জীবাত্মাকে শুদ্ধ করে জন্মমৃত্যুর পরপারে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত করবার জন্য প্রয়োজন অহংভাব অর্থাৎ আমিত্বভাব, যা নাকি জৈবিক অস্তিত্বের প্রধান উপকরণ, তার সমূল উচ্ছেদ। বেদান্তবাদীদের মতে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ, অর্থাৎ বৈষয়িক আসক্তি এবং জৈবিক প্রবৃত্তি ত্যাগ, তথা সামূহিক তীব্র বৈরাগ্যের মাধ্যমেই আমিত্ববোধের এই মৃত্যু ঘটানো সম্ভব।

মানুষের আত্মচেতনা, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিকাশের প্রয়াস এবং নিজ সৃজনীশক্তির সাহায্যে জাগতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত এবং উন্নত করবার বাসনাই তার স্বাধীনতা চেতনার মূল উপাদান এবং তার স্বাধীনতা কামনার ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ। অথচ এদেশের সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক কাঠামো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনমানসের গহনে দার্শনিক তত্ত্বের আবরণের অন্তরালে স্বাধীনতার এই মূল উপাদানগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছে। যে সংস্কৃতি গরিষ্ঠসংখ্যক দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষের অসহনীয় জীবনদশাকে পূর্বজন্মের কর্মফল এবং অদৃষ্টবাদ দ্বারা সমর্থন করে, লক্ষ লক্ষ মানুষের এই অবস্থার

চেষ্টা এবং অসম ও স্বৈরাচারী আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে, দারিদ্রকে নৈতিক সমর্থন জানায়, অর্থনৈতিক বিকাশের বিরোধিতা করে, জাগতিক উন্নতির আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিহত করে, নারীকে পুরুষের ভোগ্য দ্রব্য হিসাবে গণ্য করে এবং পুরুষের তথাকথিত জীবাত্মার মুক্তির জন্য তাকে জড়বস্তুর মতো ত্যাগ করতে বলে, সে সংস্কৃতির কাঠামোর অভ্যন্তরে মানব স্বাধীনতার স্ফূরণ এবং বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ কদাপি সম্ভব নয়। যে দেশের সংস্কৃতি পৃথিবীকে মিথ্যা এবং অনিবার্যভাবে সতত দুঃখময় জ্ঞান করতে শিক্ষা দেয়, মানুষকে শেখায় নিজের শরীর এবং জৈবিক অস্তিত্বকে ঘৃণা করতে, আর মানুষের মৌলিক আমিত্ব বোধের উচ্ছেদকেই তার আধিভৌতিক মুক্তির উপায় বলে প্রচার করে, সেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা চেতনার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে এ ধরনের সাংস্কৃতিক কাঠামো প্রকৃতপক্ষে শোষক শ্রেণী এবং তাদের মুখপাত্রদের শ্রেণীস্বার্থে তথাকথিত আধ্যাত্মিক মুক্তির নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রচিত এবং প্রচারিত হয়েছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য আমজনতার স্বাধীনতা চেতনার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা এবং এভাবে সেই আর্থসামাজিক কাঠামোকে চিরায়ত করা যা শোষক শ্রেণীর শোষণশাসনের ধারক ও বাহক। অথচ এই সূক্ষ্ম অপসাংস্কৃতিক কাঠামোর গভীর প্রভাব শুধু যে এদেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই নয়। পৌরাণিক কাহিনী, চারণকবির গান, কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষের মধ্যেও এর প্রভাব এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে তারা সাধারণত এই সূক্ষ্ম অপসংস্কৃতির মূল তত্ত্বগুলিকে স্থূল সত্য বলেই ধরে নেয়, আর এভাবে নিজের শোচনীয় জীবন-দশাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এই ভ্রান্ত চেতনার ফলে প্রকৃতপক্ষে অসহনীয় আর্থসামাজিক কাঠামোই তাদের কাছে সহনীয় এবং গ্রহণীয় বলে মনে হয়। এক অর্থে স্বাধীনতার এখানে স্বেচ্ছামৃত্যু। আর এভাবেই সূক্ষ্ম অপসংস্কৃতির অস্ত্রের সাহায্যে শোষক শ্রেণী সমাজের গরিষ্ঠ অংশের স্বাধীনতাকে সূক্ষ্মভাবে হত্যা করে।

স্বাধীনতা একটি অখন্ড সত্তা। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো যেখানে স্বাধীনতার পরিপন্থী, সেখানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্বাধীনতার সার্থক রূপ দিতে পারে না। বরঞ্চ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো সেখানে

রাজনৈতিক এবং আর্থিক গণতন্ত্র আর বিকাশকে অনিবার্যভাবেই প্রতিহত করে। এই পরিস্থিতিতে মূল দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর নয়। এক দিকে আর্থসামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর স্রষ্টা আর নিয়ন্তা শোষক শ্রেণী, আর অন্য দিকে তাদের শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণী এবং জনখন্ডের মানুষের মধ্যে। রাষ্ট্র যদি শোষক শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আর ফলস্বরূপ অসম এবং স্বৈরাচারী আর্থসামাজিক কাঠামোর পৃষ্ঠপোষক হয়, তবেই রাষ্ট্রের সঙ্গে শোষিত শ্রেণী আর জনখন্ডের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার একটি সর্বজনীন রূপ আছে। যে সমাজে শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষ স্বাধীন, আর সবাই পরাধীন, সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা অবর্তমান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন কোন দেশ নিজে স্বাধীন থেকে অন্য অনেক দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণশাসন চালালে বলা যায় না যে পৃথিবীতে স্বাধীনতা আছে, এবং পৃথিবীর মনুষ্যসমাজ স্বাধীনতা ভোগ করছে, তেমনিভাবে দেশের অভ্যন্তরে সমাজের অংশবিশেষ শোষণমূলক এবং স্বৈরাচারী তরিকায় বাকি সকলের উপর আধিপত্য করলে সে সমাজকে স্বাধীন বলা যায় না। আমি স্বাধীন আর আমার সামাজিক পরিবেশ পরাধীন—এ পরিস্থিতির তখনই উদ্ভব হতে পারে যখন এই দুয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। আর এ পরিস্থিতিতে মানব স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং রূপায়িত হয়েছে একথা বলা সম্ভব নয়।

অতএব এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে রাষ্ট্র যদি জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়, তবে অবস্থাবিশেষে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব বলতে অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বই বোঝায়। যে আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনখন্ডের স্বাধীনতার পরিপন্থী, সে কাঠামোর রূপান্তর প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। এই নৈতিক দায়িত্ব একমাত্র সে রাষ্ট্রই অস্বীকার করতে পারে যে রাষ্ট্র গণতন্ত্রের নামাবলী এবং তথাকথিত উদারপন্থী মুখোশের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং পৃষ্ঠপোষক।

উদাহরণস্বরূপ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কথা ধরা যেতে পারে। ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে দুইশত বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং অকরুণ আর্থিক শোষণ অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু তারা আমাদের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল, যদিও এ সত্য

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না যে এদেশের সমকালীন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো স্বৈরাচারী, শোষণমূলক কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিজ্ঞানবিরোধী ছিল। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের তৎপরতার ফলে দুয়েকটি পারিবারিক ক্ষেত্রে (যথা সতীদাহ এবং বাল্যবিবাহ রোধ) আইনের মাধ্যমে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের ধর্মান্তরণের প্রয়াসে উৎসাহিত করা ছাড়া বৃহত্তর সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা কখনও হস্তক্ষেপ করেনি। ইংরেজ সরকার অবশ্য এই যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল যে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, অতএব এদেশের জনগণের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরোধী। কিন্তু পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই যুক্তি ছিল স্পষ্টতই হাস্যাস্পদ। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল যে ভারতের বিপুল জনতা অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকলে, অসম সামাজিক কাঠামো দ্বারা বহুধা খন্ডিত থাকলে, আর অপসংস্কৃতির কাঠামো দ্বারা স্বাধীনতা চেতনা থেকে নিবৃত্ত থাকলে, এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর শোষণ বাধামুক্ত এবং চিরস্থায়ী হত। আর এ ব্যাপারে তাদের সাহায্যকারী ছিল উত্তর-পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীক্ষিত কিছু উচ্চমধ্যবিত্ত আমলা, বুদ্ধিজীবী আর সুযোগসন্ধানী, জমিদার-মহাজন-সুদখোর শ্রেণী আর ধনতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী। সামগ্রিকভাবে এই মুৎসুদ্দি শ্রেণী একাধারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় আর্থসামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কাঠামোর পৃষ্ঠপোষক ছিল। ইংরেজরা ভেদনীতি প্রয়োগ করে এদেশের বহুধাবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় আর গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করত, আর শাসন সংস্কারের কথা উঠলেই এইসব পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীকে একসঙ্গে আলোচনায় ডেকে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করত যেখানে তারা সহজেই দুই ঝগড়াটে বিড়ালের মধ্যে পিঠেভাগকারী বানরের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারত। এশিয়া-আফ্রিকার অন্যান্য দেশে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করবার নামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাম্রাজ্যবাদ একই ভেদনীতি অবলম্বন করে এসেছে।

স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতির সহাবস্থান, সমান সুযোগসুবিধা, এবং সমন্বয়ের আদর্শের উপর অধিষ্ঠিত। সংবিধানের মুখবন্ধে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের নাম খোদিত থাকলেও আমাদের আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর কোন প্রত্যক্ষ আঘাত কিংবা

তাদের মৌলিক পুনর্বিন্যাস এবং রূপান্তরের কোন বাস্তব বিধান সংবিধানে নির্দিষ্ট হয়নি। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সে তথাকথিত উদারপন্থী নিরপেক্ষতার নীতিই আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থান পেয়েছে যা গড়ে উঠেছিল ইউরোপের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, এবং উত্তর-পশ্চিমী দুনিয়ার ধনতন্ত্রবাদের পরিপ্রেক্ষিতে। সরকার বিভিন্ন জাতিবর্ণ এবং সম্প্রদায়কে কিছু আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিচ্ছে, যার প্রয়োজন এবং যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু এ নীতি আবহমান কাল ধরে চলে আসা আমাদের স্বৈরাচারী শোষণমূলক আর্থসামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক অপকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন করতে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনী রাজনীতি এবং আর্থিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নীতি সম্ভবত এই কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করছে। সরকারি কিংবা বেসরকারি রাজনৈতিক দলগুলি, যারা আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক, তারাও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় নীতি কিংবা প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে আমাদের নির্বচন ব্যবস্থা মূলত জাতিভেদ এবং ধর্মীয় অপসংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যারা এই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর প্রত্যক্ষ আঘাত করবে, তাদের পক্ষেই নির্বাচনী বৈতরণীতে সুখসন্তরণ কঠিন হয়ে পড়বে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের আধুনিক রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী 'উদারপন্থী' ভেদনীতিরই নামান্তর। কোন-কোন উত্তর-পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং তাদের ভারতীয় অনুগামীরা অবশ্য বলে থাকেন যে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থ রূপায়িত হচ্ছে এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে এসব স্বার্থের সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্র প্রকাশিত এবং বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ সত্যই স্পষ্ট হবে যে মানবতা বিরোধী এবং স্বাধীনতা বিরোধী সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কদাপি প্রকৃত স্বাধীনতার উন্মেষ সম্ভব নয়, মেকি গণতন্ত্রের ভ্রান্ত তাত্ত্বিকেরা যতই যুক্তিজাল বিস্তার করুন না কেন। প্রকৃতপক্ষে এহেন রাজনৈতিক কাঠামো স্বাধীনতা বিরোধী আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে, এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কার্যত এই কাঠামোর নিয়ন্তাদের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা অবলম্বন করে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পুনর্নির্মাণ না করে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর রূপান্তর সম্ভব হবে না। কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে, যদিও সাংস্কৃতিক

কাঠামো কালক্রমে অনেকখানি স্বাতন্ত্র্য এবং দুর্মরতা লাভ করে, আদিতে এ কাঠামো থাকে প্রধানত আর্থিক অবকাঠামোরই উপকাঠামোবিশেষ। কিন্তু এই তুলনামূলক স্বাতন্ত্র্য এবং দুর্মরতার ফলেই সাংস্কৃতিক অপকাঠামো ভারতবর্ষের মতো অনেক দেশে আর্থসামাজিক কাঠামোর রূপান্তরকেও দুঃসাধ্য করে তোলে। অতএব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং পরে রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তথা জনশক্তির সাহায্যে অপসাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর কঠিন আঘাত হানা অপরিহার্য।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সর্বক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বৃহত্তর এবং অখন্ড মানব স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক, এবং মানব সভ্যতার ভবিষ্যতের দিশারী। একমাত্র সেসব সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের উপরই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এবং বাঞ্চনীয় যা দ্বারা স্পষ্টতই দমন এবং শোষণমূলক আর্থসামাজিক কাঠামোর সৃষ্টি অথবা শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, যা স্পষ্টতই বিজ্ঞানবিরোধী, অথবা যা জনসাধারণের একাংশের, এমনকি বৃহত্তর অংশের, অশিক্ষা-কুশিক্ষাপ্রসূত ভ্রান্ত চেতনার ফল, এবং তাদের স্বাধীনতা চেতনার পরিপন্থী। অপরাপর সমস্ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত। কিন্তু এ সত্যও সহজেই অনুমেয় যে ভারতবর্ষের মতো অনেক সনাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় দেশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

৪

ভারতে গণতন্ত্র

গণতন্ত্র নামক সাধারণ শব্দটি সম্প্রতি ভারতের মাটিতে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। আর নিজ মহিমায় ভারতবর্ষকেও অসাধারণ করে তুলেছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিকল্প সরকার গঠন করতে পেরেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই কোন না কোন ধরনের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা বর্তমান। ভারতও সম্প্রতি সে পথেই পা বাড়িয়েছিল। আর তৃতীয় বিশ্বময় ব্যাপ্ত স্বৈরাচারের নজির দেখিয়ে কিছুসংখ্যক ধূর্তভন্ড রাজনীতিক এবং মেরুদন্ডহীন বুদ্ধিজীবী এদেশে গণতান্ত্রিক 'নরম' রাষ্ট্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রী কঠিন রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু মানুষ ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে সে অসভ্যবিধি এবং তার ধারক ও বাহকদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করে স্বৈরাচারের তখত-এ-তাউস নড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৪৭ এর পর থেকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অহংকারে। মদমত্ত স্বৈরাচার ভারতবাসীর সে একমাত্র অহংকার ধুলিসাৎ করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। ভারতের আমজনতা সে স্বৈরাচারকে ধরাশায়ী করে পৃথিবীর সামনে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র ভারতবাসী, কৃষক ভারতবাসী, মজুর ভারতবাসী, মধ্যবিত্ত ভারতবাসী নগ্ন সে বর্বরতাকে ক্ষমা করেনি।

কিন্তু স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের এই শুভলগ্নে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই মৌলিক সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না যে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের অধিকার গণতন্ত্রের আবশ্যিক বহিরঙ্গ মাত্র, তার সামগ্রিক রূপ নয়। অতএব সম্প্রতি যা ঘটেছে তা এ দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে শুভকর এবং

প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ ও স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। দেড় বছরের তানাশাহী শাসনে নিষ্পেষিত জনগণ একটা রাজনৈতিক তুফানের মাধ্যমে নিঃশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব স্বৈরাচারীদের যে নিজেদের স্বাধীনতা ও মৌলিক স্বার্থ রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু গণতান্ত্রিক-আদর্শের শব্দময় প্রচারের পিছনে যে বিপুল বিভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান, আর প্রকৃত গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বিক এবং সার্থক রূপ দিতে যে কঠিন রচনাত্মক প্রয়াসের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।

রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের এমনই প্রতিষ্ঠা যে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজেকে গণতন্ত্রপ্রেমী বলে দাবি করে, তা তার রাজনৈতিক কাঠামো যেমনই হোক না কেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই শব্দঝরা রাজনীতির গভীরে প্রবেশ করে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবন করা সহজসাধ্য নয়। আমাদের দেশেও সম্প্রতি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদসংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে বিরামহীন প্রচার চালানো হয়েছে যে প্রকৃত গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যেই নাকি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করেছেন এবং এভাবে জনগণের তথা দেশের শত্রুদের পরাস্ত করে জাতির নিরাপত্তা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করেছেন। দেখা গেছে এ প্রচারে অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং স্বভাবত আদর্শবাদী যুবসমাজের একাংশও বিভ্রান্ত হয়েছেন।

একথা সত্য যে কোন রাজনৈতিক আদর্শই মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায় না। ইতিহাসের এক খণ্ডকালের সীমায়িত পরিধিতে কোন দেশের ও সমাজের বাস্তব পরিবেশে, যেকোন রাজনৈতিক আদর্শ এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। এ অবশ্যম্ভাবী স্বকীয়তা সব রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রেই সত্য। ভারতীয় গণতন্ত্র এ সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তা আমাদের বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে গণতান্ত্রিক আদর্শ আমাদের দেশে কিংবা অন্য যে কোন দেশে কতকগুলি ন্যূনতম মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। নতুবা এক আদর্শ থেকে অপর আদর্শের কোন পার্থক্যই করা সম্ভব হত না। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি রাজনৈতিক আদর্শই মৌলিক নীতি ও সূত্রের ন্যূনতম

বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে দেশে তার আকারগত পার্থক্য সম্ভব, কিন্তু তা বুনিয়াদকে অস্বীকার করে দাঁড়াতে পারে না। অর্থাৎ প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্যাদা পেতে হলে যে-কোন দেশের গণতন্ত্রকেই কতকগুলি ন্যূনতম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নচেৎ বুঝতে হবে যে কায়েমী স্বার্থ অপর কোন জনবিরোধী আদর্শের গায়ে গণতন্ত্রের বিজ্ঞাপন দিয়েছে মাত্র।

আধুনিক যুগে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছিল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। সর্বজনীন ভোটাধিকার, স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং সংগঠনের অধিকার, আর আইনের শাসনই ছিল এহেন গণতন্ত্রের রাজনৈতিক আদর্শ। অর্থাৎ ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেই (Individualism) রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে বাধাবন্ধহীন প্রতিযোগিতা (perfect competition) প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ আইনরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল, আর কোন রকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থব্যবস্থাকে রাষ্ট্র বিনা হস্তক্ষেপে (laissez faire) চলতে দেবে, আর সে অবিরাম প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মে আপন গতিতে এগিয়ে চলবে, এই ছিল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিপূরক অর্থনৈতিক রূপ। ইউরোপীয় গণতন্ত্রবাদীরা মনে করলেন যে সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং অন্যান্য মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে ব্যক্তিমানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আইনের শাসন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদাভেদ তুলে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে, এবং জনসাধারণের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারগুলির রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। আর আর্থিক ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বুনিয়াদ রচনা করবে আর্থিক স্বাধীনতা ও সাম্যের।

কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ফলে দেখা গেল যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আদি গণতান্ত্রিক আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই অসফল এবং পথভ্রষ্ট। বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার নামে অচিরেই কেন্দ্রীভূত পুঁজি ও একচ্ছত্র কারবার গড়ে উঠল। ফলে অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে শোষণে নিপীড়িত সমাজের গরিষ্ঠ অংশের এক বিরাট ঐতিহাসিক সংঘাত দেখা দিল। কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার আইন এবং প্রশাসনযন্ত্র প্রধানত ধনিকের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গণতান্ত্রিক আদর্শের ছত্রতলে দুটি নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব হল। প্রথমটি সংস্কারপন্থী বা তথাকথিত উদারনৈতিক

(Liberal) চিন্তাধারা। এই ধারার চিন্তকগণ পুঁজিবাদকে সংশোধিত করে কিভাবে শ্রেণীসংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, সে প্রয়াসে যত্নবান হলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হবসন, তৃতীয় দশকে লর্ড কেইন্‌স এবং পরবর্তীকালে সুমপিটার এবং গলব্রেথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ এই চিন্তাধারার পরিপোষক। কিন্তু এই সংশোধনী প্রয়াস গণতান্ত্রিক আদর্শের উজ্জ্বলতাকে অম্লান রাখতে পারেনি। প্রথমত, জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদভিত্তিক গণতন্ত্রে অসাম্য চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে এবং মুনাফা ও বিত্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজ দেশে যদিও বা রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আংশিক সফলতা লাভ করেছে, অপর দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলি প্রাচ্য দুনিয়ায় বর্বরোচিত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেছে। রাজনৈতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, আর সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিবিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ ছিল তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ। প্রাচ্য দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণজাগরণের ফলে সে ঐতিহাসিক বর্বরতা স্তিমিত হলেও নয়া সাম্রাজ্যবাদ তার স্থান দখল করেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অসমনীতি, বহুজাতিক শিল্পসংস্থা (multinational corporation) প্রভৃতির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে উন্নতিশীল দেশগুলির আর্থিক শোষণ অবিরাম চলছে। অনেক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এই মত পোষণ করেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর্থিক শোষণ বন্ধ হয়ে গেলে পাশ্চাত্ত্য জগতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে তাদের বর্তমান জীবনমান রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পরিশেষে উল্লেখ্য, এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘে কিংবা সাধারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উন্নতিশীল দেশগুলির সমান অধিকার স্বীকার করতে পাশ্চাত্ত্য দুনিয়া আজও পরাঙ্মুখ। সংগত কারণেই অতএব প্রাচ্য দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষ পুঁজিবাদভিত্তিক পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জওহরলাল নেহরু, ডঃ বি আর আম্বেদকর, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং নেতৃবর্গ দ্বিধাহীন ভাষায় পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দিতে অস্বীকার করেছেন।

পুঁজিবাদভিত্তিক ভ্রষ্ট গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া মার্কসবাদ। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী অসাম্য এবং শ্রেণীচরিত্রের বিশ্লেষণ করে মার্কস বললেন যে, উৎপাদনের উপকরণের উপর এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সামাজিক মালিকানা (socialization) প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেহেতু মার্কস মনে করতেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ পরিবর্তন অসম্ভব, তাই তিনি সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব দাঁড় করালেন। বর্তমান লেখকের মতো আরো অনেকেই মনে করেন যে মার্কস প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামগ্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। আর্থিক ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাভিত্তিক গণতন্ত্রের স্বপ্নই দেখেছিলেন তিনি। ভারতীয় মার্কসবাদীরা অতএব বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রকৃত জনগণতন্ত্রের অন্তিম আদর্শ বলে স্বীকার করেন না।

গণতন্ত্রের রাজনৈতিক আঙ্গিকগুলি সম্বন্ধে প্রথমেই বলা যায় যে সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করে দিলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর বহু স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বড় বড় মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার অভাবে এবং স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রভাবে এসব বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারের বিশেষ অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবার অধিকার এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা গণতন্ত্রের ন্যূনতম বুনিয়াদেরই অভাব হয়ে পড়ে। এদেশে সম্প্রতি তথাকথিত জরুরী অবস্থার নামে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তা গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। ভারতে গণতন্ত্রকে নির্বিঘ্ন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এমন সাংবিধানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজনে যে কোন অজুহাতে আমজনতার মৌলিক অধিকারগুলি হরণ এবং সরকারি স্বৈরাচারের বিচার বিভাগীয় প্রতিকারের পথ বন্ধ করা সম্ভব না হয়।

দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার ক্ষমতাসীন হলেই প্রকৃত গণতন্ত্র রচিত হয় না। সরকারী দল নিজেদের শাসনকে

চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে আইন করে জনসাধারণের সব রকম মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে পারে, দলীয় স্বার্থে বহু রকম জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিতে পারে, অথবা আইনের মাধ্যমে নিজেদের নানারকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা করে নিতে পারে। অতএব সরকারী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জনস্বার্থ ও ন্যায়বিচারের মৌলিক চরিত্রকে নষ্ট করছে কিনা, তা বিচার করবার অধিকার উচ্চপর্যায়ের স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ আদালতের উপর ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। সংসদীয় আইনের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (judicial review) অতএব গণতন্ত্রের অপরিহার্য আঙ্গিক। ভারতে জরুরী অবস্থার মধ্যে শাসকদল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এমন ভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে এবং অন্যান্য অনেকগুলি আইন ও অর্ডিনান্স পাশ করেছে যা দৃশ্যতই জনস্বার্থ, ন্যায়বিচার এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। এদেশে গণতান্ত্রিক আদর্শের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য এহেন কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তির সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রসত্তা গণতন্ত্রের অপরিহার্য আঙ্গিক। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অগণিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। অতএব রাষ্ট্রশক্তি কেন্দ্রীভূত থাকলে জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ হন। ফলে গণতন্ত্রও কার্যত কেবল মুখের বুলিতে পরিণত হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় তাই রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে প্রায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। দেশে গণতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয় এবং ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ এই। ভবিষ্যতে সুস্থ গণতন্ত্রের স্বার্থে শাসন ব্যবস্থায় এবং শাসকদলে যাতে এভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়, এবং ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীবিশেষের ক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি এক না হয়ে যায়, সেদিকে জনসাধারণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনেও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতের মত দেশে কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, সর্বভারতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি অল্প কয়েকটি বিষয় রেখে বাকি সব বিষয় এবং ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে ছেড়ে

দিলে তবেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। এমনকি রাজ্যগুলিকে অনেক পরিমাণে, বিশেষত শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, স্বাধীন বিদেশ নীতি গ্রহণ করবার অধিকার দিলেও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তির বিশেষ কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে এদেশে অংগরাজ্যগুলি প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতার কাছাকাছি ক্ষমতা অর্জন করলেই গণতন্ত্র বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কোন রাজনৈতিক দল (তা সে সরকারী দলই হোক বা বিরোধী দলই হোক) যদি বৎসরের পর বৎসর অভ্যন্তরীণ দলীয় নির্বাচন বন্ধ রাখে, যদি সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের স্বৈরাচারী প্রথায় নমিনেশনের মাধ্যমে উপর থেকে নিয়োগ করে, আর যখন নির্বাচন হয় তখনও উপর থেকে সব প্রার্থী চাপিয়ে দিয়ে নির্বাচনকে উপহাসে পরিণত করে, তবে ক্রমশ সারা দেশেই গণতান্ত্রিক আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। এ অবস্থায় উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব এবং কিছুসংখ্যক ধূর্ত স্তাবকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নূতন রক্ত বইতে পারে না, সাধারণ কর্মীরা উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমশ জনসাধারণ, এমনকি দলীয় কর্মীরা নিজেরাও, দলের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বিগত দশকের ভারতীয় রাজনীতি থেকে কংগ্রেস দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রে যেমন একদিকে আছে সরকারী নীতি তথা অপর কোন রাজনৈতিক আদর্শ বা দলের সমালোচনার অধিকার, তেমনি আছে আত্মসমালোচনার দায়িত্ব। মৌলিক আত্মানুশাসন (self discipline) না থাকলে গণতন্ত্র বিশৃংখলার রাজনীতিতে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা থাকে। জরুরী অবস্থা অথবা অন্য কোন ধরনের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু না থাকলেই যদি স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা প্রভৃতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, রাস্তায় রাস্তায় যদি দিনের পর দিন আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, ট্রাম-বাস-ট্রেন যদি ঠিকমত না চলে, আর এভাবে যদি সমগ্র জনজীবন দিনের পর দিন বিপর্যস্ত হতে থাকে, তবে জনসাধারণের এক অংশ আবার কোন না কোন ধরনের স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষপাতী হয়ে পড়বে। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মালে তবেই গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। আত্মসমালোচনা, আত্মানুসন্ধান এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সার্থক হয়ে

উঠতে পারে। নতুবা সতত বিশৃংখলাময় নেতিবাচক গণতন্ত্র নিজের শৃংখলাহীনতায় শেষ পর্যন্ত নিজেই ভেঙ্গে পড়ে।

আর্থিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধু বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের ফলেই আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। জাতীয়করণের অর্থ ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ। কিন্তু তারপর যদি আমলাশাহী পরিচালনা ব্যবস্থা চালু করা হয় তাহলে আর্থিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ থাকে না। অতএব প্রকৃত গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয়কৃত শিল্পসংস্থাগুলিকে জনপ্রতিনিধি ও শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় রূপান্তরিত করতে হবে। সম্ভবস্থলে জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে মালিকানার অংশীদারও করতে হবে। রাষ্ট্রীয়করণ আর সমাজীকরণের মধ্যে এই প্রধান পার্থক্য। আর্থিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও তানাশাহীর মধ্যেও মূল প্রভেদ এই। কিন্তু এ ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। জাতীয়কৃত শিল্পসংস্থায় প্রধানত আমলাশাহী চালু হয়েছে, তার ফলে আর্থিক গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরাচারী শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে বিপুল আয়ের বৈষম্য বর্তমান থাকলেও আর্থিক গণতন্ত্র সম্ভব নয়। কারণ এ বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী রূপেই রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের রূপ নেয়। আয়ের পার্থক্য একেবারে তুলে দিয়ে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা বর্তমান পৃথিবীতে সম্ভব নয়, এবং কোন রাজনৈতিক আদর্শই সেকথা বলে না। কিন্তু জাতীয় আয়ের বন্টনে মানবতাধর্মী নীতি গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। এই নীতির প্রধান উপাদান হল এক দিকে ক্রমবর্ধমান সমাজীকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের মূলোচ্ছেদ করা, আর অন্য দিকে দেশের সংখ্যাগুরু দরিদ্র অংশের স্বার্থে জাতীয় পুঁজির নিয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রয়াসকে পরিচালিত করা। বর্তমান ভারতে আর্থিক বৈষম্য অত্যন্ত তীব্র। সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাধিক অসাম্যকলঙ্কিত দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। এই চোরাবালির উপর গণতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী বুনিয়াদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য, ভারতের মত বহুধা বিভক্ত সমাজে গণতন্ত্রের কতকগুলি মৌলিক সামাজিক আঙ্গিকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশেষত, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুসংস্কার এদেশের মানুষের অস্থিমজ্জায় বাসা বেঁধেছে, আর সমাজকে উচ্চনীচ স্তরে বহুধা বিভক্ত করেছে। কিন্তু মানুষের জন্মগত সাম্য যে দেশ স্বীকার করে না, সেদেশে রাজনৈতিক ও আর্থিক সাম্যের স্থান কোথায়? গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে এদেশে মজবুত করে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জাতিভেদের আশু বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে জড়িত মানসিক

প্রবৃত্তি ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন। অনুরূপভাবে ধর্মভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করে মানবতাবাদের উপর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের ধর্মীয় পরিচয়কে অস্বীকার করা এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিধির বাইরে এসে বিজ্ঞান ও মানবতাধর্মী বৃহত্তর মানবতাবাদে আস্থা স্থাপন করতে জনশিক্ষার মাধ্যমে আমজনতাকে উৎসাহিত করা। কিন্তু জাতিভেদ ও সংকীর্ণ ধর্মপ্রবণতা বিরোধী গণতন্ত্র আজও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগত সমস্যাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ পদ্ধতির উপরই গণতন্ত্রের গতি ও প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রথম প্রশ্ন অর্থের। সাধারণত দেখা যায়, বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে অর্থের এক ধরনের বিশেষ যোগসূত্র থাকার ফলে গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিকই কলুষিত হয়ে পড়ে। নির্বাচন পরিচালনা করতে এবং সম্বৎসর দলীয় কার্যালয়, শাখা-উপশাখা, ফ্রন্ট সংগঠন, সভা-সমিতি, সর্বক্ষণের কর্মী প্রভৃতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। কোন কোন বামপন্থী দল অবশ্য সদস্যদের উপর লেভির মাধ্যমে এবং সমর্থকদের কাছ থেকে চাঁদার মাধ্যমে বেশ কিছু আর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ অপ্রতুল। অন্য সব দল বিত্তবান শ্রেণীর বিত্তর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ক্ষমতাসীন দল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলিও সাধারণত এই অর্থ সংগ্রহ করে প্রধানত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জোতদার, প্রমোটার, কনট্রাকটার প্রভৃতির কাছ থেকে। আর এ পদ্ধতির দুটি অনিবার্য কুফল অচিরেই অনুভূত হয়। প্রথমত, আর্থিক ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের কাছে রাজনৈতিক দল এভাবে বাঁধা পড়ে বলে তার পক্ষে প্রকৃত আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জনসেবার বুলি তখন শুধু জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থের প্রভাবে দলের মধ্যেও বিভিন্ন ভ্রষ্টাচার দেখা দেয় এবং দলের বহু সংখ্যক সদস্য আদর্শ রূপায়ণের কথা ভুলে গিয়ে অর্থলাভের উদ্দেশ্যেই রাজনীতি করে। উপরতলার দলীয় সংগঠন ক্রমশ আদর্শবাদীদের হাত থেকে সরে গিয়ে অর্থশিকারীদের কব্জাগত হয় এবং নীচের তলার সংগঠন সমাজবিরোধীদের হাতে চলে আসে। আর কিছু নীতিজ্ঞানবর্জিত ভন্ড রাজনীতিক মুখে জনসেবার শ্লোগান দিয়ে একদিকে পুঁজিপতি ও জোতদারদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আর অন্যদিকে এসব সমাজবিরোধীদের কুকর্মের নেতৃত্ব দেয়। অবশেষে নির্বাচনের সময়ও আদর্শ

কর্মীর অভাবে সমাজবিরোধীদের কুকর্মের মাধ্যমে এবং অর্থবলে নির্বাচন জয়ের চেষ্টা করা হয়।

কোন কোন রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে। ফলে তাদের পক্ষে ভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তল্পীবাহক হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিশ্লেষণ এবং নিজেদের রাজনৈতিক কলাকৌশল নির্ণয় তারা অপর দেশের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই করে থাকে, এদেশের জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থে নয়। এহেন দলের কার্যকলাপে যে ভারতীয় গণতন্ত্র বিশেষভাবে বিপন্ন হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিদেশী অর্থে পুষ্ট কিছু সংবাদপত্রও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা অবলম্বন করে থাকে। আর এভাবে বিষাক্ত করে তোলে এদেশের গণতন্ত্রকে।

নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে এবং দলীয় কার্যকলাপের ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত করে আর্থিক সমস্যার কিঞ্চিৎ সুরাহা সম্ভব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বিরাট দেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত না হেনে এই অর্থ সংগ্রহ করতে হলে তা কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসংগঠন এবং জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য সৃজনধর্মী ও মঙ্গলকর কর্মসূচী। কিন্তু ভারতবর্ষের খুব কম রাজনৈতিক দলই আজ পর্যন্ত এই কঠিন পথে পা বাড়িয়েছে। ফলে অর্থ ভারতীয় গণতন্ত্রের অনর্থ করে চলেছে।

পদ্ধতিগত দ্বিতীয় সমস্যা গণআন্দোলনের, যার একটি দিক রচনাত্মক ও অপরটি রক্ষনাত্মক। ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কার, ক্ষুদ্রশিল্পের বিস্তার এবং আর্থিক উন্নয়ন সফল না হবার একটি প্রধান কারণ লোকশক্তির পথ পরিত্যাগ করে আমলাতন্ত্রের সাহায্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়াস। আমলাতন্ত্র সর্বত্রই আদর্শহীন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক। অতএব এই পদ্ধতিতে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন এবং আর্থিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একমাত্র সংহত গণশক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে একমাত্র আদর্শভিত্তিক ও স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনই আর্থিক গণতন্ত্র রচনার প্রধান উপায়। এ ধরনের গঠনমূলক গণআন্দোলন ব্যতীত ব্যাপক এবং দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন এবং ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। ফলে গণতন্ত্র অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য। তেমনিভাবে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি এদেশের বিভিন্ন সামাজিক কলুষ দূর করে এক নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে হলেও রচনাত্মক গণআন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন

দেশে গণতন্ত্র অসফল হবার একটি প্রধান কারণ আর্থিক ক্ষেত্রে ও সমাজ সংস্কারে গণশক্তির ব্যবহারের অভাব। উপযুক্ত গঠনমূলক গণআন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলে ভারতীয় গণতন্ত্রও অদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন হয়ে পড়বে।

রক্ষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রকৃত গণতন্ত্রে গণআন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। শাসকদলের স্বৈরাচারী প্রবণতাকে সংযত রাখতে হলে, এবং স্বৈরাচার প্রকট হয়ে পড়লে তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে, সর্বব্যাপী গণআন্দোলন ব্যতীত আর কোন পথ নেই। শুধু নির্বাচনই স্বৈরাচারের যথেষ্ট প্রতিবন্ধক নয়, কারণ যেকোন নির্বাচিত দলই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই মতবাদের যাথার্থ্যই প্রমাণ করে। অতএব যাঁরা বলেন যে সাংবিধানিক গণতন্ত্রে সরকারবিরোধী গণআন্দোলনের স্থান নেই, তাঁরাই প্রকৃত গণতন্ত্রের শত্রু। তাছাড়া একমাত্র গণআন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতি প্রকৃত গণতন্ত্রের রূপ ধারণ করতে পারে। নতুবা জনসাধারণ রাজনীতির ঘটনাস্রোত থেকে বহু দূরে পড়ে থাকেন, আর কিছু সংখ্যক সুযোগসন্ধানী লোক জনসাধারণের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের ক্ষমতালিপ্সা এবং আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজনীতিকে ব্যবহার করে। এরা অনেকেই রাজনীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত কোষাগার ও সম্পত্তি সৃষ্টি করে এবং সন্তানসন্ততিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশে শিক্ষা দেয়—যে শিক্ষার বৈদেশিক মুদ্রায় বিপুল ব্যয়ভারের বুদ্ধিতে কোন ব্যাখ্যা চলে না। ব্যাপক গণসংগঠন ও গণআন্দোলনই অতএব প্রকৃত গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। আর ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে একমাত্র জননিয়ন্ত্রিত উন্নত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই লোকশক্তির সৃজনশীলতা তথা প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব।

কিন্তু পদ্ধতির প্রশ্নে সাধারণ পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌল নীতি অহিংসা। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার এবং পারস্পরিক মতামত ও আদর্শের প্রতিযোগিতায় জনমত গঠনই গণতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থার প্রধান উপাদান। হিংস্রাশ্রয়ী রাজনীতি অতএব নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের প্রধান দূষমণ। আবার এ সত্যও নিস্মৃত হলে চলবে না যে অহিংসার অর্থ সব সময় স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয়, অতএব সর্বব্যাপী শান্তিও নয়। গণশক্তির যে ব্যাপক জাগরণ ও সংহতি গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র, তার ফলে পরিবর্তনের মুখে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে যে অনিবার্য সংঘাত দেখা দেবে, সাধারণ পরিস্থিতিতে সে সংঘাত অহিংস গণআন্দোলনের রূপ নিলে তবেই গণতন্ত্র রক্ষা পাবে। তবে অসহনীয় স্বৈরাচার ও শোষণশাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অসফল জনগণ যদি কখনও অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হন, তবে সে সশস্ত্র পন্থাকেও গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

৫

ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ সংজ্ঞা ও পন্থা

এদেশে সাধারণত ইংরেজী 'সেকিউলারিজম'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'ধর্মনিরক্ষেতা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর অন্য অনেক দেশের ধর্মরাষ্ট্রের তুলনায় এই ধর্মনিরপেক্ষতাই ভারতের গর্ব। অন্তত স্বাধীনতার পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তাই ছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি 'সেকিউলারিজম'-এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়। এই নিবন্ধ থেকে ক্রমশ তা পরিষ্কার হবে। অথচ কোনও শব্দ একটি জনপ্রিয় অর্থে একবার প্রচলিত হয়ে গেলে গণচেতনার গভীরে সাধারণত সে শব্দটিই স্থায়ী হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তখন সে শব্দটির পরিবর্তে সঠিক অর্থের জন্য অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করলে তা জনমনে সহজে স্থান পায়না। সে কারণে আমরা এ নিবন্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে ধরে রেখে তার প্রকৃত অর্থ নিরূপণের চেষ্টা করবো। আশা করি আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ ধর্মহীন অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন রাষ্ট্রীয় রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি। নিজ ধর্মে সম্পূর্ণ আসক্ত থেকে অপর ধর্মকে সহ্য করা নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক সব ধর্মকে সমান ভাবে উৎসাহিত করবার নীতিও ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। একথাও প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্ভব। যে কোনও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়, বিশেষত যেখানে কোনও একটি বিশেষ ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত, সেখানে রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাষ্ট্র ধর্মের উপর অধিষ্ঠিত থাকে। সেখানে রাষ্ট্র মৌলবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অতএব প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র।

কিন্তু মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে আমরা এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। যে রাজনৈতিক জোট বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন, তার

সবচেয়ে বড়ো এবং প্রধান দলটি বার বার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে তারা হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের রাজনৈতিক পরিবারের গণসংগঠনগুলিও সনাতন হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। জোট সরকারের অংশীদার আরও দুয়েকটি দলও কট্টর ধর্মরাষ্ট্রপন্থী। জোট রাজনীতির সাময়িক বাধাবন্ধের ফলে প্রধান দলটি এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেনি। কিন্তু মৌলবাদী দলগুলি যদি ভবিষ্যতে নিরংকুশ ভাবে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করতে পারে, তবে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অপমৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। অতএব বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ও মৌলবাদের এই দ্বন্দ্বমূলক সন্ধিক্ষণে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞা এবং পন্থা উপলব্ধি করা এদেশের চিন্তাশীল মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

সেকিউলারিজম শব্দটি মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতি এমন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায় যা আভিধানিক অর্থেই ধর্মবিমুখ এবং জগৎমুখী। 'রিলিজিয়াস' বা ধর্মীয় শব্দটির বিপরীতার্থক হিসেবেই 'সেকিউলার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিশ্বমানবতার উপরে অধিষ্ঠিত। এই ধর্মহীনতার অর্থেই প্রাচীন ভারতের লোকায়ত বা চার্বাকবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। আর এই অর্থেই আঠারো শতকে ইউরোপের জ্ঞানবাদী আন্দোলনের মধ্যে, এবং পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সেকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল।

ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার এই প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম বিষয়ে অন্য দুটি সুপরিচিত রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে আলাদা করে বোঝা প্রয়োজন। কারণ ধর্মের প্রতি যে কোনও ধরনের উদার মনোভাবকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোনও ব্যক্তিমানুষ নিজ ধর্মে সম্পূর্ণ আসক্ত এবং সে ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। কিন্তু তিনি অপর ধর্মের অস্তিত্ব সহ্য করে নিতে রাজি আছেন। সেসব পরধর্মের মানুষের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল নন, কিন্তু সহনশীল। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রের জীবনে এ ধরনের ধর্মনীতির নাম ক্যাথলিসিজম বা কসমোপলিটানিজম, অর্থাৎ সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন সহনশীলতা। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব বা নীতিকে ধর্মের প্রতি উদাসীনতা অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা আখ্যা দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় উদাহরণ, কোনও ব্যক্তিমানুষ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত এবং একনিষ্ঠ। তিনি নিজ ধর্মকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। কিন্তু একই সংগে তিনি একথাও

মানতে রাজি আছেন যে অন্য ধর্মের মধ্যেও কিছু সত্য নিহিত আছে। যদিও সেসব ধর্ম তার নিজের ধর্মের চেয়ে হীনতর। আর দেশকাল অনুযায়ী সেসব ধর্মও মানুষকে অন্তত কিছুটা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই অর্থেই যতো মত, ততো পথ। এ তত্ত্ব বা নীতিকে এক্লেক্টিসিসম বা সর্বধর্মসমভাব বলা যেতে পারে। কিন্তু এটিকেও ধর্মনিরপেক্ষতা বলা সম্ভব নয়।

ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হলে তবেই রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শুধু যে কোনো রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না তাই নয়। উপরন্তু রাষ্ট্রের সমস্ত নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণে সব রকমের ধর্ম ও ধর্মচিন্তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। আর এই নিরিখেই বিচার করতে হবে যে ভারতীয় সংবিধানে তথা সরকারি নীতি ও কার্যক্রমে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা কতোখানি বাস্তবায়িত হয়েছে বা হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির কোনও উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে জরুরী অবস্থা চলাকালে ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মুখবন্ধে সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ যুক্ত করা হয়। কিন্তু অনেক আগে রচিত সংবিধানের অন্যান্য ধারায় ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে ধর্মের স্বাধীনতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। এ থেকে মনে হতে পারে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এ ধারাতেই নিহিত আছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পরেই আবার ২৫(১) ধারায় ধর্মের প্রতি আরও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছেঃ "সব মানুষেরই নিজ নিজ ধর্ম ঘোষণা, আচরণ এবং প্রচারের সমান অধিকার আছে।" ২৬(১) ধারায় আরও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক নামাঙ্কিত ধর্ম বা ধর্মগোষ্ঠীর অধিকার আছে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবার, নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেরা ব্যবস্থাপনা করবার, আর ধর্মীয় প্রয়োজনে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রয়, গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা করবার।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সংবিধানে সব ধর্ম, ধর্মগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি এবং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একথা মনে

করাও যুক্তিসম্মত যে সব ধর্মের মানুষকেই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত থেকে ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সংবিধানে উৎসাহিত করা হয়েছে। এহেন ধর্মনীতি যে উপরে আলোচিত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞার পরিপন্থী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তব প্রয়োগের প্রসংগ বাদ দিলেও শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই একথা সত্য। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি রোধের জন্য সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ ধারাই যথেষ্ট ছিল। কারণ ১৪ ধারায় বলা আছে যে সব নাগরিকেরই আইনের সামনে সমান অধিকার আছে। এর সংগে ১৫ ধারা যোগ করলে ধর্মের কারণে বৈষম্যের আরও কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু উপরে আলোচিত সংবিধানের অন্যান্য ধারাগুলি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে সংবিধানের রচয়িতারা ধর্মকে প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসাহ দিতেই চেয়েছিলেন। সব ধর্মের মানুষই গভীর ভাবে ধার্মিক হবে, নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আসক্ত থাকবে, আর তারপর বিধর্মীদের প্রতি সহনশীল হবে, এই ছিল সংবিধান রচয়িতাদের মূল ভাবনা। রাষ্ট্রও জনগণের ধর্মাশক্তিকে উৎসাহিত করবে, কিন্তু কোনও ধর্মের মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না, এই ছিল সংবিধানভিত্তিক রাষ্টনীতি।

সব ধর্মকে সমান উৎসাহ দেবার এই নীতি অনুসরণ করেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মের নিরিখে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে চলেছে। এক করে ফেলা হয়েছে প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিচয়। এভাবে যে শুধুমাত্র ধর্মের পরিচয়ে এদেশের নাগরিকদের সনাক্তকরণ চলছে তাই নয়। মানুষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্থানাংকও অনেকখানি নির্ধারিত হচ্ছে এভাবেই। রাষ্ট্রের উদ্যোগে এবং নির্দেশে যা কোনও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হওয়া একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অসংগত। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভাজন কোনও দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং বলবৎ হলে সে দেশকে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না।

একই সংগে আইন ব্যবস্থায়ও ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের বিভাজনের নীতিই এদেশে বলবৎ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, নারীর অধিকার, ইচ্ছাপত্র রচনা প্রভৃতি অনেক গুরুত্ব পূর্ণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক-সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রভিত্তিক প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিধান রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বলবৎ রয়েছে। ধর্মহীন

সর্বজনীন আইনের ক্ষেত্র সীমিত। কিন্তু প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা আংশিক ভাবেও ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধানের উপর অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

আবার অনেক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং আইন হিন্দুধর্মের মানুষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষদের প্রতি, বিশেষত মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক অবিচারের প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সংবিধানের ১৫(৪) এবং ১৬(৪) ধারা অনুযায়ী দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর বর্গের মানুষদের জন্য শিক্ষা এবং চাকুরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মুসলিমদের, অথবা তাদের কোনও অংশের জন্য এ ধরনের কোনও ব্যবস্থা বা অধিকার সংবিধানের কোথাও নেই। তেমনি ভাবে হিন্দুদের মন্দির প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মসজিদ বা গির্জার বেলায় নেই। আবার অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক আয়কর আইন আছে। অথচ মুসলিম বা অন্য কোনও ধর্মের মানুষের জন্য এ ধরনের কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেই। ভারতবর্ষকে কি অতএব প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যায়? রাজনৈতিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব ধর্মভিত্তিক এবং বৈষম্যমূলক আইন ও নিয়মকানুন ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী।

যে কোনও রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দিক আছে। রাষ্ট্র একটি আধিবিদ্যক বা বিমূর্ত সত্তা নয়। তার প্রধান উপাদান যেমন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একটি বিশেষ জনসমষ্টি, তেমনি সে জনসমাজে শ্রেণীগত, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বিভাজন ও সংঘাত বর্তমান। শাসক শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাদের নীতি প্রণয়ন এবং রূপায়ণে তাদের শ্রেণীচরিত্র, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির অনিবার্য প্রতিফলন ঘটে থাকে। ভারতীয় সংবিধানও এমন কিছু মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রণীত হয়েছিল, যারা কিছুটা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণপরিষদে আসীন হয়েছিলেন। অতএব শুধুমাত্র সংবিধান বা আইনের পরিচয়ে নয়, শাসক গোষ্ঠীর লোকব্যবহারেও ধর্মাসক্তি এবং ধর্মীয় পক্ষপাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় গণতন্ত্র বহুদলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। আর দুয়েকটি বিশেষ বামপন্থী দল ছাড়া বাকি সব দলের নেতা ও সদস্যেরা অবাধে ঘরে ও বাইরে ধর্মকর্ম করে থাকেন। এদেশের বামপন্থী দলগুলির সদস্যদের অনেকের মধ্যেও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা কতোখানি গভীর তা বলা কঠিন। মোট কথা রাজনৈতিক নেতা ও তাদের অনুগামীদের নিজ ধর্মবিশ্বাস

ও ধর্মীয় আচরণ শুধুমাত্র তাদের গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সেসব তাদের লোকব্যবহারে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপে প্রতিফলিত হতে এবং প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। একজন রাজনীতিক যদি নিজ ধর্মে গভীর ভাবে আসক্ত হন, আর তিনি যদি উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে আসীন থাকেন, তবে তার লোকব্যবহারে, রাজনৈতিক আদর্শে এবং কার্যক্রমে তিনি তার নিজ ধর্মবিশ্বাস দ্বারা অনিবার্য ভাবেই প্রভাবিত হবেন। সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক ধর্মনিরপেক্ষতাও ব্যাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সংবিধানে যাই লেখা থাকুক না কেন।

সে কারণে যেসব রাজনীতিকেরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতায় নিবেদিতপ্রাণ বলে ঘোষণা করেন, তাদেরও বেশির ভাগই নিজেদের আচরণে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রূপায়িত করতে ব্যর্থ হন। একমাত্র জওহরলাল নেহরু ছাড়া আর প্রায় প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীই ঘটা করে ধর্মপালন করেছেন, আর তাদের রাজনৈতিক জীবনে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এরা পথে ঘাটে, শহরে-গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন, মসজিদে প্রার্থনা করেছেন, আর অগণিত বাবা-গুরু-স্বামীজি-পুরোহিতের চরণে শরণ নিয়েছেন। অবশ্য সর্বদাই আগে থেকে প্রচার মাধ্যম এবং আলোকচিত্রের সুবন্দোবস্ত করে। ভারতের প্রায় সব রাষ্ট্রপতিও একই রকম ধর্মাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আর জনসমক্ষে দেবদেবী-বাবা-গুরুদের প্রতি ভক্তিভাব প্রচার করেছেন। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সব মুখ্যমন্ত্রী, এমপি, এমএলএ, প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, উচ্চ আদালতের বিচারক, উচ্চপদাধিকারী আমলা, তথা শাসক শ্রেণীর প্রায় সব সদস্যই নিজ নিজ ধর্মীয় পুজোপার্বণ, প্রার্থনা-উপাসনা, আর বাবা-গুরুদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে থাকেন। কলকাতা কর্পোরেশনের ২০০০ সালের নির্বাচনের পর একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভাবী মেয়র সহ সব পুরপিতা দলবদ্ধ ভাবে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং কপালে পুজোর তিলক পরে তারপর মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যান। রাজনীতির রণেবনে, জলে-জঙ্গলে বিপদে পড়লেই রাজনীতিকেরা এভাবে দেবদেবী, গুরু-বাবাদের শরণ নিয়ে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী এই রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় পোষাক পরে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচার মাধ্যমকে সংগে নিয়ে যোগ দিয়ে থাকেন। রাজনীতিকদের এ ধরনের লোকব্যবহারে রাষ্ট্রের যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে তা কি ধর্মনিরপেক্ষতার, না ধর্মীয় রাজনীতির পরিচায়ক?

উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণ অনিবার্য ভাবেই রাষ্ট্রীয় নীতির প্রণয়ন ও রূপায়ণে প্রভাব ফেলে থাকে। একথা বিশেষ ভাবে রাষ্ট্রশক্তিতে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং সে দলের নেতাদের প্রতি প্রযোজ্য। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রিত্বের কালে তারই পৃষ্ঠবলে কুখ্যাত ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর রাজনৈতিক উত্থান এবং কার্যকলাপ যেভাবে এদেশের গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছিল তা সর্বজনবিদিত। তেমনি ভাবে নরসিংহ রাওয়ের প্রধান মন্ত্রিত্বের কালে তারই পৃষ্ঠবলে চন্দ্রস্বামীর রাজনৈতিক অভ্যুদয় এবং বেপরোয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও দুর্নীতি ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিষিয়ে তুলেছিল। এটিও কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে নরসিংহ রাওয়ের মতো একজন কট্টর হিন্দু প্রধানমন্ত্রী বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মুখে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে অপারগ হয়েছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী, শিক্ষামন্ত্রী মুরলী মনোহর জোশী প্রমুখ ফোঁটা-তিলকধারী, সনাতন হিন্দুধর্মে অন্ধ বিশ্বাসী, মুসলিম এবং খ্রিস্টান বিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য এবং পুজারী, রামরাজ্যের ধারক ও বাহক, এবং হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তাদের পক্ষে সংবিধানে খোদিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা কদাপি সম্ভব নয়। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের তাগিদে যদিও সাময়িক ভাবে তাদের মৌলবাদী রাষ্ট্রাদর্শ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক নেতাদের সকলেই যে প্রকৃত ধর্মান্ধতা থেকে ধর্মীয় রাজনীতিতে আসক্ত হয়ে থাকেন, তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার লক্ষ্যে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন মাত্র। দারিদ্র এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, বঞ্চিত শোষিত জনগণের সামনে নিজ ধর্মীয় ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারলে লোকসংগ্রহে সুবিধা হবে, লোকযাত্রা অনুধাবন করে ধূর্ত রাজনীতিকেরা অনেক আগেই এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। আর সে কারণেই তারা আগে থেকে উচ্চ গ্রামে প্রচারের বন্দোবস্ত করে তারপর পথেঘাটে ধর্মাচরণ করে থাকেন। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ধার্মিক নন, আর সারাবেলা মিথ্যাচার, কপটতা, জনবঞ্চনা, দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে বিভীষণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন প্রজাদের বশে রাখবার উদ্দেশ্যে সর্বদা ধর্মাচরণ করতে আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে। কৌটিল্য শাসকশ্রেণীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিভাবে প্রজাসাধারণকে

বশে রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে বহু বিচিত্র আপাতধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মজাদুর ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে তার বিস্তারিত উপদেশ এবং অনেকগুলি ধর্মজাদুর বর্ণনা আছে। বর্তমান কালেও শাসক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের কপট ব্যবহার একই ভাবে চলে আসছে। সে কারণেই সম্পূর্ণ অধার্মিক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলিম লিগের ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের নামে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে তার উচ্চতম পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। সে কারণেই ইন্দিরা গান্ধী আদর্শহীন রাজনীতি এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, আর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংবিধানে খোদাই করা সত্ত্বেও জনগণের সামনে নিজের ধর্মীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বদা তৎপর থেকেছেন। মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন, বাবা-গুরু-পুরোহিতদের পায়ে টিভি ক্যামেরার সামনে সাষ্টাংগ হয়েছেন। একই কারণে রাজীব গান্ধী অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের কাছে রাম জন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে। অথবা রাষ্ট্রপতি শংকরদয়াল শর্মা কাঞ্চীর শংকরাচার্যের পদসেবারত অবস্থায় ছবি তুলে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। অথবা প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে একসংগে সাতজন পুরোহিতের সামনে সাষ্টাংগে প্রণিপাত করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন, এ ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অথবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বুটা সিং-এর মাথায় পা রাখা অবস্থায় মাচান বাবার ফটো বেরিয়েছে।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠীর সকলেই যে রূপকথার রাম ও কৃষ্ণ, অথবা সব রকম দেবদেবী বা যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করেন, তা নয়। কারণ তাদের সকলেই ধীশক্তিতে অনুন্নত, একথা বিশ্বাস করা যায় না। একথা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে তাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মান্ধতা এবং মৌলবাদকে তাদের ব্যক্তিগত তথা দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার রূপে কুপরিকল্পিত রূপে ব্যবহার করে থাকেন। আর সে কারণেই রামরথযাত্রা, ইটপুজো মিছিল, নানা পুজোপার্বণ ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন। উদ্দেশ্য জনসাধারণের একাংশের ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ।

কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের ফলে হোক, অথবা ধূর্ত রাজনীতিকদের জনবঞ্চনার দুরভিসন্ধি থেকেই হোক, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি রচনা ও রূপায়ণের দিক থেকে তাতে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় রাজনীতির ফলশ্রুতি কার্যত এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নীতি ও কার্যক্রমে ধর্মের অনুপ্রবেশ, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি

ধর্মনিরপেক্ষতার গ্লানি ও হানি। আর ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মই যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রে সহজে অনুপ্রবেশ করে, অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার হানির অর্থ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা কোনও না কোনও ধরনের ধর্মরাষ্ট্রের প্রবর্তন।

সাংবিধানিক বিধিবিধান এবং রাষ্ট্রীয় আচারের ভিত্তিতে অবশ্য ভারতবর্ষকে মৌলবাদী রাষ্ট্র বলা চলে না। কারণ সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এক ধরনের পরধর্ম সহিষ্ণুতা বা সর্বজনীন ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কোনও মৌলবাদী রাজনৈতিক দল দীর্ঘকাল শাসন ক্ষমতা কায়েম রাখতে পারলে অবশ্য এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু ধর্ম সংক্রান্ত রাষ্ট্রনীতির নিরিখে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক তথা রাজনৈতিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত অন্যান্য মৌলবাদী দেশের তুলনায় অনেক বেশি উদার এবং সর্বজনীন। কিন্তু ধর্মহীনতা অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে সব ধর্মকে সমান উৎসাহ দেবার সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত করেছে। সাংবিধানিক কাঠামো এবং ব্যবহারিক রাজনীতির নিরিখে ভারতবর্ষকে একটি আধা-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে। কিন্তু পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে না। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতা বা ধর্মে উদাসীনতার দিকে এগুতে হলে এদেশে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আরও মৌলিক ধ্যানধারণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেদিকেই এখন আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করবো।

অনেকেরই এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই বুঝি কোনও না কোনও ধর্ম আছে। সে ধর্ম প্রধান প্রধান বড়ো ধর্মগুলির একটিই হোক, বা কোনও আদিম অথবা অসংগঠিত ধর্মই হোক। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার (১৯১১) পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ৫৮০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৯০ কোটি মানুষের কোনও ধর্ম নেই। এদের মধ্যে রাশিয়ায় প্রায় ১১ কোটি মানুষের কোনও ধর্ম নেই। অর্থাৎ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গিয়ে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে মার্কসবাদ বিলুপ্ত হবার পরেও রাশিয়ার বহু সংখ্যক মানুষ বংশানুক্রমিক কিংবা অন্যভাবে কোনও ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চিনদেশে প্রায় ৬৪ কোটি মানুষের কোনও ধর্ম নেই। ধর্মের হিসেবে খ্রিষ্টানরা পৃথিবীতে সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি, ৩৩.৬ শতাংশ। তারপর মুসলিমরা দ্বিতীয়, ১৮.২ শতাংশ, আর হিন্দুরা তৃতীয়, ১৩.৫ শতাংশ। এদিকে পৃথিবীতে মোট ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা ২০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে মুসলিম

ধর্মাবলম্বী অথবা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেশি।

তাছাড়া পারিবারিক সূত্রে কোনও না কোনও ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে যেসব মানুষ জন্মেছেন, তাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সজ্ঞানে ধর্মত্যাগ করেছেন। ১৯১১ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পশ্চিম ইউরোপের প্রধানত জন্মগত খ্রিষ্টানদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাসের হার কমে আসছে এবং নাস্তিকদের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সে ৩৮ শতাংশ, ব্রিটেনে ২২ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানিতে ২২ শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ৩৬ শতাংশ, বেলজিয়ামে ৩১ শতাংশ, সুইডেনে ৫৫ শতাংশ, নরওয়েতে ৩৫ শতাংশ, ডেনমার্কে ৩৬ শতাংশ, বেলেরাসে ৫৭ শতাংশ, ল্যাটভিয়ায় ৪২ শতাংশ, এবং জাপানে ৩৫ শতাংশ মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ তারা ধর্মকে অসার ও অপ্রয়োজনীয় জেনে স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করেছেন। আর মনে রাখতে হবে যে এসব দেশের অধিকাংশই শিক্ষায় উন্নত, বিজ্ঞানে বিকশিত এবং শিল্পসমৃদ্ধ। (দেখুন, Mattei Dogan, "The Decline of Religious beliefs in Western Europe", *International Social Science Journal,* September 19:15)

ভারতবর্ষেও প্রাচীন কাল থেকেই কয়েকটি প্রধান দর্শনে এবং ব্যবহারিক লোকযাত্রায় বস্তুবাদী নাস্তিক্য মনোভাব প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, লোকায়ত তথা বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি দর্শন আদিতে বস্তুবাদী ও নাস্তিক দর্শন ছিল, যার মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনও স্থান ছিলনা। বিশেষত লোকায়ত দর্শন ছিল বলিষ্ঠ ও আপোষহীন ভাবে বস্তুবাদী, ভূতচৈতন্যবাদী বা দেহাত্মবাদী। তাছাড়া আয়ুর্বেদ, নাট্যশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি জগৎ ও জীবনমুখী ব্যবহারিক দর্শনের মহাগ্রন্থগুলিও ছিল মূলত বস্তুবাদী ও ধর্মহীন। আধুনিক ভারতেও বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত, উন্নতমনা এবং আদর্শবাদী নাস্তিক মানুষ বাস করেন।

অতএব ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচর্চা এবং ধর্মপ্রচার যদি মৌলিক মানবিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি পায়, তবে একই সঙ্গে যে কোনও মানুষের ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতাকেও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। কারণ নিজের জিন কিংবা অংগপ্রত্যংগের মতো একটি বিশেষ ধর্ম নিয়ে কোনও মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। মানবশিশুর জ্ঞান হবার আগেই তার মা-বাবা, পরিবার এবং সমাজ অবোধ শিশুর উপর নিজেদের ধর্ম চাপিয়ে দেয়। শিশুর অজান্তে, এবং তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে নিজ

পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে তার একটি বিশেষ ধর্ম লাভ হয়। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সেই বিশেষ ধর্মটির সব মৌলিক বিশ্বাস ও তত্ত্ব, ধর্মগ্রন্থ, খাদ্যাখাদ্য, আচার-ব্যবহার এবং নিত্যকর্ম আত্মস্থ করে নেয়। পরিবার কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম আশৈশব আত্মগত এবং অভ্যাসে পরিণত হবার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে এক প্রশ্নাতীত অন্ধ বিশ্বাসের রূপ পরিগ্রহ করে।

অন্য ভাবে বলা যায় যে ধর্ম মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য আংগিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি মানবজীবনের অন্যান্য অনেক আদর্শের মতোই গ্রহণীয় বা পরিত্যাজ্য, জ্ঞানবিচারের নিরিখে। আমি সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রের সমর্থক হতে পারি। আবার পরবর্তীকালে নিজ বিচারবুদ্ধিতে এদের মধ্যে একটি আদর্শকে ত্যাগ করে অন্যটি গ্রহণ করতে পারি, অথবা সবগুলিকেই বর্জন করতে পারি। আমি একটি নূতন নিজস্ব আদর্শও রচনা করতে পারি। কোনও প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমা দ্বারা এভাবে কোনও একটি বিশেষ আদর্শ বর্জন বা গ্রহণকে সমদৃষ্টিতে দেখবে, এবং এর জন্য আমার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ বা অত্যাচার করবে না। ধর্মও প্রকৃতপক্ষে এরকম একটি ব্যক্তিগত আদর্শ মাত্র, যা জন্মলব্ধ নয়, পরিবার ও সমাজ কর্তৃক ব্যক্তিমানুষের উপর আশৈশব চাপিয়ে দেওয়া একটি সংস্কার মাত্র। পার্থক্য এই যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আদর্শ গ্রহণে চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানবিচারের অবকাশ আছে। কিন্তু ধর্মমাত্রই শুধু কল্পনা ও অন্ধবিশ্বাসের উপর অধিষ্ঠিত, যেখানে বিচারবুদ্ধির কোনও স্থান নেই।

উপরের আলোচনা থেকে আরও একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও অবোধ শিশুর বিচারবুদ্ধি জন্মাবার আগে তার উপর পিতামাতার ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বা আচার-বিচার চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। বিচারবুদ্ধি জন্মাবার বয়স যদি আঠারো ধরা হয়, তবে এ বয়সের আগে কোনও শিশু বা কিশোরের উপর পিতৃপুরুষের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী, অতএব অগণতান্ত্রিক। আঠারো বছর বয়স হবার পর যুবক-যুবতীরা নিজেরাই স্থির করবে যে তাদের কোনও ধর্মের প্রয়োজন আছে কিনা, এবং যদি থাকে তবে সেটি কোন ধর্ম। এমনও হতে পারে যে বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক যুবক-যুবতীদের অনেকেই কোনও ধর্মেরই প্রয়োজন অনুভব করবে না। আর অসহনীয় পারিবারিক ও সামাজিক চাপ না থাকলে তারা কোনও ধর্মই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের কবল থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক মানবসন্তানকে

রক্ষা করা, আর সে উদ্দেশ্যে আঠারো বছরের নিচের কোনও মানুষের ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না দেওয়া। আর প্রয়োজনে আইন পাশ করে শিশু ও কিশোরদের উপর ধর্ম আরোপ নিষিদ্ধ করা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা ক্রমশ যে মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌছোচ্ছি তা এই যে কোনও ব্যক্তিমানুষকে বা মানবগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র ধর্মের পরিচয়ে চিহ্নিত করা, এবং তার ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা গণতন্ত্রবিরোধী, অযৌক্তিক ও অমানবিক। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ নিরামিষভোজী। কিন্তু সে কারণে আমরা নিরামিষভোজীদের সংখ্যাগুরু আর আমিষভোজীদের সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে সে ভিত্তিতে দুই সম্প্রদায় সৃষ্টি করি না। আর তাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করি না বা দাঙ্গা বাধাই না। আবার অধিকাংশ মানুষ ধুতি পরে, আর তুলনায় কম সংখ্যক লোক প্যান্ট পরে। সে ভিত্তিতেও পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় না। এমনিতর অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষের বহু বিকল্প চিন্তাধারা, বহু বিকল্প এবং পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস এবং আচার-ব্যবহার প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সেসব কারণে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সংঘাত সৃষ্টি হয় না। মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, চরিত্রগুণে, লোকব্যবহারে, সমাজ সচেতনতায়, কর্মোদ্যোগে, বিচারবুদ্ধিতে, সুকৃতিতে, সৃজনশীলতায়। তার ধর্মে বা ধর্মহীনতায় নয়। ধর্ম মানুষের অনেক রকম আদর্শের মধ্যে মাত্র একটি আদর্শ। বলা যায় ধীশক্তির বিচারে নিকৃষ্ট আদর্শ, কারণ মানুষ এটি বিনা বিচারে আশৈশব আপন করে নিতে বাধ্য হয়, পরিবারের অন্ধ প্রশিক্ষণে আর সমাজের পীড়নে। শুধুমাত্র ধর্মের নামে মানুষের সনাক্তকরণ অতএব গণতন্ত্র ও মানবতার অপমান মাত্র। আর প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ব্যক্তিমানুষের বাধ্যতামূলক ধর্ম অথবা ধর্মের পরিচয়ে রাজনৈতিক বা আর্থসামাজিক স্থানাংক নির্ণয় অকল্পনীয়।

পরিশেষে প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ কোন দিকে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে মূলত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের জাগতিক চেতনায় পরিবর্তন আসে। শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষের তথাকথিত চিত্তশুদ্ধি বা 'হৃদয়ের পরিবর্তনের' মধ্য দিয়ে চৈতন্যের পরিবর্তন সুদূর পরাহত। মানুষের ব্যক্তিজীবনে অনুশীলন ও সাধনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা মানুষকে বা তার সমাজকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। একমাত্র অনুকূল জাগতিক পরিবেশ নির্মিত হলেই মানবজীবনে নবচেতনার উন্মেষ ত্বরান্বিত হতে পারে। কোনও রাষ্ট্র

সম্বন্ধেও সেকথা সত্য। বর্তমানের কলুষিত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকৃত গণতন্ত্র রচিত না হলে এদেশে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের অবসান এবং দ্রুত আর্থিক বিকাশ ও সমবন্টন না হলে প্রকৃত মানবতাবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। সেই সংগে আরও প্রয়োজন ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণের বিজ্ঞানমনস্কতার দ্রুত বিকাশ। অর্থাৎ প্রকৃত গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এদেশে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাবও বিলম্বিত হবে।

৬

ধর্ম ও রাজনীতি

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রাচীন কাল থেকেই দেশে দেশে শাসক শ্রেণী আমজনতার উপর তাদের শোষণ-শাসন কায়েম রাখবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে। প্লেটো তার *রিপাবলিক* গ্রন্থে শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন জনসাধারণকে বশীভূত রাখবার জন্য জেনেশুনেই একটি অলীক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করে। এই সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হবে যে ঈশ্বর পৃথিবীর গর্ভে সব মানুষকে সৃষ্টি করবার সময় কিছু মানুষের মধ্যে সোনা, কিছু মানুষের মধ্যে রুপো, আর বাকি সব মানুষের মধ্যে তামা ও লোহা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আর এভাবেই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস ঈশ্বরের ইচ্ছায় চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। কৌটিল্য তার *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে বলেছেন যে রাজা এবং পুরোহিতেরা যেন প্রজাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করবার জন্য বেদ থেকে মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে এই তত্ত্ব প্রচার করে যে যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শন করে নিহত হলে মুনিঋষিদের চেয়েও উচ্চতর স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। তাছাড়া নিজ প্রজাদের বশীভূত রাখবার জন্য এবং প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাজিত করবার উদ্দেশ্যে নানারকম ধর্মীয় ভাঁওতা প্রয়োগের উপদেশ *অর্থশাস্ত্রের* সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর পৃথিবীর সব দেশেই রাজা ও তাদের অন্নভোজী পুরোহিতেরা রাজাদের ঐশ্বরীয় উৎপত্তি এবং তাদের অনুশাসনের অলৌকিক উৎসের তত্ত্ব প্রচার করে এসেছে। যেকোন ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে এভাবে শাসক শ্রেণী সর্বদাই তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু এই নিবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনা প্রধানত ভারতবর্ষে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত রাখব। অবশ্য ধর্ম ও রাজনীতির

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা সাধারণ আলোচনা করা হবে।

মনু রাজাদের ঐশ্বরীয় উৎপত্তির তত্ত্ব, চাতুর্বর্ণ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অসম আর্থসামাজিক কাঠামো ঈশ্বর দ্বারা রচনার তত্ত্ব, এবং শাসক শ্রেণী দ্বারা রচিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বিধানগুলি অলৌকিক উৎসের তত্ত্ব নিপুণভাবে প্রচার করেছেন। এভাবেই হিন্দধর্মের ভিত্তিমূল *মনুস্মৃতিতে* ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে স্পষ্টতই ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি উপনিষদের রচয়িতারাও ধর্মের রাজনৈতিক প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ *ঈশাবাস্যোপনিষদ* প্রথম শ্লোকেই বলছে ঃ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।।

— ঈশ্বর চলমান জগতের সর্বত্র বিরাজমান আছেন। তিনি তোমার জন্য যা ত্যাগ করেছেন তাই ভোগ করো, অন্য কারোর ধনে লোভ কোরো না।

প্রশ্ন ওঠে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, এই তত্ত্বের সঙ্গে ধনবন্টনের প্রশ্নকে জড়িয়ে পরের ধনে লোভ না করবার উপদেশ দেওয়া হল কেন? সহজ উত্তর এই যে এই শ্লোকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অসম ধনবন্টনকে সমর্থন জানানো, আর এভাবে ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি করা। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবানের মুখে এই উক্তি প্রচার করা হয়েছে যে তিনি স্বয়ং চাতুর্বর্ণ্য প্রথা সৃষ্টি করে তার উপর মানুষের সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাছাড়া শূদ্র এবং নারীদের ধর্মশাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলিত আর্থসামাজিক হীনস্থানকে ঐশ্বরীয় সমর্থন জানিয়ে শ্রীভগবানের অনেক প্রবচন *ভগবদ্গীতায়* সংকলিত হয়েছে। এভাবে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর মুষ্টিমেয় পরগাছা শাসক শ্রেণীর শোষণ-শাসনকে চিরায়ত করবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মের এ ধরনের রাজনৈতিক প্রয়োগের উদাহরণ *রামায়ণ-মহাভারতের* সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

মধ্যযুগে এদেশে তুর্কি-আফগান এবং মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে হিন্দু রাজা, সামন্ত, সমাজপতি এবং পুরোহিতকুলের রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়। এ সময়ে হিন্দু সমাজের শাসক শ্রেণীর পক্ষে বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির রাজনৈতিক মোকাবিলা করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। কারণ ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল বলিষ্ঠভাবে আন্তর্জার্তিক, সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমষ্টিগত ঐক্যে বিশ্বাসী। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা ছিল জাতীয় স্তরে সীমাবদ্ধ, গুরুতর সামাজিক অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং

ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাছাড়া মধ্যযুগে আরব সভ্যতা ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে উন্নত সভ্যতা, আর ভারতীয় সভ্যতা ছিল অতল অন্ধকারে। এই পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের ইসলাম ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। আরেক অংশ রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে ধর্মীয় ভক্তিবাদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাও আবার অনেকটাই ইসলাম ধর্মের আদর্শে ও অনুকরণে। অন্যদিকে হিন্দু সমাজপতিরা চাতুর্বর্ণ্য প্রথাকে এবং ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট নারী ও শূদ্র-অতিশূদ্রের আর্থসামাজিক হীনস্থানকে আরও মজবুত করে ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার চেষ্টা করে। এভাবে রাজনৈতিক প্রত্যাঘাতে অক্ষম বহুধাবিভক্ত এবং অসম হিন্দু সমাজ মধ্যযুগে ধর্মকে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় তারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। ব্রিটিশ শাসনে পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং হতাশাগ্রস্ত ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সামরিক শক্তিতে হীনবল, সামাজিক ক্ষেত্রে বহুধাবিভক্ত এবং ধর্মশাস্ত্রের অন্ধ অনুশাসনে আবদ্ধ, বিজ্ঞানে অনুন্নত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র ভারতবাসীদের পক্ষে পাশ্চাত্য আগ্রাসীদের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব ছিল না। তাই তারা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে, এবং বিদেশী পন্ডিতদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মহিমার অহঙ্কারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক অবদানে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করে। বিশেষত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, *আনন্দমঠ* প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ভগবদ্গীতা' ও 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ বঙ্গদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রেরণা জোগায়। হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিক তৎপরতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে যে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, তার মধ্যেও বাসা বেঁধেছিল ধর্মীয় রাজনীতি। অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তী কালে শ্রী অরবিন্দ), বিপিন চন্দ্র পাল এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক রচনায় ও কার্যকলাপে এই হিন্দুত্বধর্মী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

অন্যদিকে ভারতীয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও অনিবার্য ভাবেই ধর্মীয়

রাজনীতির জন্ম হয়। ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজ সরকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে এবং বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। মুসলমানেরাও আগ্রাসী বিধর্মী বিদেশী শাসকদের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে এবং তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এই সুযোগে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এক অংশ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজ সরকারের অধীনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কর্মরত বাবু, ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ী মুৎসুদ্দি শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্যর সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্বে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে আলিগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে। তারপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দু ভদ্রলোকদের ধর্মীয় রাজনীতিতে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের মাধ্যমে মুসলিম ধর্মীয় রাজনীতির জন্ম হয়। এভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ধর্মীয় রাজনীতিকে ভিত্তি করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আর ইংরেজ সরকারও দুই বেড়ালের মধ্যে বানরের পিঠে ভাগ করবার নীতি অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন জোগাতে আরম্ভ করে।

বাল গঙ্গাধর তিলক গণেশ পুজো এবং *ভগবদ্‌গীতার* মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে যে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই একই নীতি অনুসরণ করে মহাত্মা গান্ধী তুলসী *রামায়ণ ও ভগবদ্‌গীতার* সাহায্যে উত্তর ভারতে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। *বাল্মীকি রামায়ণের* রাজকাহিনী নয়, তুলসীদাসের *রামচরিতমানসের* ভক্তিধর্মই রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রামসীতা ও হনুমানকে নিয়ে মধ্যযুগ থেকে উত্তর ভারতে যে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাকে রামরাজ্যের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে রামধুনের ভক্তিগীতির মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়বাদে রূপান্তরিত করেছিলেন। এভাবে তিনি উত্তর ভারতে হিন্দু কৃষকদের জাতীয় আন্দোলনে টেনে এনেছিলেন। আবার *ভগবদ্‌গীতার* কৃষ্ণভক্তি এবং নিষ্কাম কর্মের আপাত দার্শনিক তত্ত্বও তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ডে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গীতাকে তিনি জননী আখ্যা দিয়েছিলেন, আর স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে গীতায় তিনি নিজ জীবনের তথা জাতীয় জীবনের সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। তাঁর

নিজের এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা প্রতিটি আশ্রম এবং কর্মক্ষেত্রে গান্ধীজির নির্দেশে শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে সবাইকে গীতা পাঠ করতে হত। এভাবে *ভগবদ্‌গীতার* ধর্মীয় প্রেরণায় হিন্দু ভদ্রলোকদের এক অংশ গান্ধীজির নেতৃত্বাধীনে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমে পড়েছিল।

বর্তমান কালে গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গান্ধীজি প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের সপক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে। একথাও সত্য যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট ছিলেন না, সর্বধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে *রামায়ণ, ভগবদ্‌গীতা,* এবং সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত। এ কারণেই মহাত্মা গান্ধীর অবিসংবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিম জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশকে কোন প্রেরণা জোগাতে পারেনি। খিলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর কৌশলী রাজনৈতিক সমর্থন সত্ত্বেও মুসলিম জনসাধারণের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই হিন্দু ধর্মীয় স্বরূপই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের দ্বারা অবহেলিত ও অপমানিত হয়ে অধার্মিক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ প্রতিশোধমূলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ইসলাম ধর্মকে রাজনীতির প্রধান অস্ত্র হিসাবে বেছে নেন, আর এই তরিকায় মুসলিম লীগকে এবং অশিক্ষিত, দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও জিন্নাহ্ ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা ও নেতা হয়ে দাঁড়ান। এভাবেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ইংরেজ আমলে সাংবিধানিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে। আর শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ভারত বিভাগে পর্যবসিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে অবিভক্ত ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাজনীতির পেছনে ধর্ম ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান ছিল, যেগুলোকে বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন রাজনীতি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল

স্রোতে হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব প্রকট হবার ফলে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ যে শক্তিশালী হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির তৃতীয় ফলশ্রুতিরও এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, বিশেষত এই কারণে যে ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। এই তৃতীয় দিকটি হল হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরে শূদ্রশক্তির নবজাগরণ, অস্তিত্ব বিরহ এবং জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সাধারণ ঔদাসীন্য। মহারাষ্ট্রে জোতিবা ফুলের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই নবজাগরণ উল্লেখযোগ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ নেয়। মহাত্মা ফুলে *বেদ, উপনিষদ, মনুস্মৃতি, ভগবদ্‌গীতা* সহ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের সমস্ত মৌলিক ধর্মগ্রন্থগুলিকে সরাসরি আক্রমণ করেন, চাতুর্বর্ণ্য সহ জাতিভেদ প্রথার সক্রিয় বিরোধিতা করেন, শূদ্র ও অতিশূদ্রদের ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক হীনস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে জোতিবা ফুলেই ছিলেন আধুনিক ভারতে শূদ্র জগরণের প্রথম পথিকৃৎ। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার রামস্বামী নায়েকারের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী শূদ্র আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। পেরিয়ার প্রথম জীবনে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস রাজনীতিতে, এমনকি বিখ্যাত বাইকম সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস জন্মায় যে কংগ্রেস রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যে পরিচালিত, এবং এ কারণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে শূদ্রমুক্তির কোন আশা নেই। তাই তিনি এমনও বলতেন যে এদেশের শূদ্রদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। সকলেই জানেন, পেরিয়ারের আন্দোলন ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ ধারণ করে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যায়।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং হিন্দু রাজনীতির কবল থেকে শূদ্রমুক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন বাবাসাহেব ডঃ বি. আর. আমবেডকর। ভারতবর্ষের বর্তমান এবং অতীত রাজনীতিকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষিত। নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এবং এদেশের শূদ্রশক্তির শৃংখলিত হীনস্থান ও লাঞ্ছনার বেদনায় তিনিও ব্রাহ্মণ্যবাদভিত্তিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেকে এবং শূদ্রমুক্তি আন্দোলনকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখেন। এ কারণে অনেক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ডঃ আমবেডকরের সমালোচনা এবং

বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় স্বরূপই ডঃ আমবেডকরকে দলিত শূদ্র-অতিশূদ্র শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। আর এ অবিশ্বাস ও সন্দেহের অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ হিন্দু ধর্ম ও রাজনীতির গভীরে প্রোথিত ছিল এবং আছে। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম আন্দোলনের মতোই বিক্ষুব্ধ শূদ্র আন্দোলনও জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের হিন্দু ধর্মীয় স্বরূপের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গড়ে উঠেছিল।

১৯১১ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন সংজ্ঞা অথবা ব্যাখ্যা নেই। অতএব শাসক শ্রেণীর ভাষ্যই সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক এবং নৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে যথেষ্ট ধোঁয়াশা এবং গোঁজামিল আছে। কারণ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার সমাজবৈজ্ঞানিক অর্থ ধর্মের প্রতি ব্যক্তিমানুষের এবং রাষ্ট্রের উদাসীনতা, আর ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আসক্তি। কিন্তু এদেশের সরকারি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমান উৎসাহদান এবং শাসক শ্রেণীর ধর্মান্ধতাই রূপায়িত হয়েছে। এভাবে সব মানুষের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রবল হলে, এবং রাষ্ট্র তাতে উৎসাহ জোগালে ধর্মান্ধতা এবং ধর্মীয় রাজনীতি অবশ্যম্ভাবী। এহেন ধর্মোৎসাহী ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা চতুরভাবে এই তত্ত্ব প্রচার করে থাকে যে ধর্ম ব্যক্তি মানুষের একান্ত প্রাইভেট বিষয়। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের ধর্মনিষ্ঠ হওয়াই উচিত, অন্তত অনুচিত হয়। কিন্তু এই প্রাইভেট ধর্মকে পাবলিক রাজনীতি থেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখা কর্তব্য। তবেই ধর্মনিরপেক্ষতা রূপায়িত হবে। কিন্তু চালাকি দ্বারা মহৎ কর্ম হয় না, আর এই চতুর তত্ত্বের ভিত্তিতেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মহীন রাজনীতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ ধর্ম কোন বিমূর্ত অলৌকিক সত্তা নয়। তার মূল মানব সমাজের বিবর্তনশীল আর্থসামাজিক কাঠামোর গভীরে নিহিত আছে, তার স্থূল জাগতিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে। ধর্ম অন্তরে-বাইরে মানুষের সামগ্রিক জীবন এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবহারকে প্রচ্ছন্নভাবে অধিকার করে ফেলে। ধর্মবিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত রাজনীতিতে অতএব ধর্মের অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে।

এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্র কোন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়।

শাসক শ্রেণীর কিছু মানুষই রাষ্ট্রের পরিচালনা করে থাকে। তাদের আচরণই রাষ্ট্রের আচরণ। যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকেরা স্বাধীনতার পরে এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে, তারা প্রায় সকলেই ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মাচারী। তারা যাগযজ্ঞ, পুজোপার্বণ, মন্তরতন্তর, গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, মস্তকমুন্ডন প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত। এদের বেশির ভাগই কোন না কোন গুরু-বাবার চেলা, যাদের নিয়মিত দর্শন করে এরা কুর্সিরক্ষা ও উন্নতির জন্য পরামর্শ নেয়, এবং সম্ভবত সে পরামর্শ মতোই সরকারি কাজ পরিচালনা করে। একজন সিনিয়র প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ভারত সাধু সমাজের সভাপতি ছিলেন। আরেকজন প্রাক্তন সিনিয়র কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী করণ সিং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এক জওহরলাল নেহরু ছাড়া বাকি সব হিন্দু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই কমবেশি একই পথের পথিক ছিলেন এবং আছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও জনৈক ধর্মগুরুর শিষ্য, যাগযজ্ঞ-পুজোপার্বণে অভ্যস্ত, আর হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মগুরুদের সন্দর্শনে এবং আশীর্বাদ ও পরামর্শ প্রার্থনায় উৎসাহী। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি.এন.শেষন সম্প্রতি প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটি প্রাইভেট বিমান ভাড়া করে মৃত কাঞ্চীর শংকরাচার্যকে সমাহিত করবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা বাতুলতা মাত্র।

আধুনিক কালে যেসব দেশে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব কমে এসেছে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রথমে শিল্পায়ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনে কিছুটা বৈরাগ্য এসেছে। যদিও ইউরোপের অনেক দেশেই ধর্মীয় নামযুক্ত রাজনৈতিক দল এখনও অনেক আছে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও White Anglo-Saxon Protestantism (WASP) অথবা শ্বেতচর্ম অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রজাতির প্রোটেস্টান্ট ধর্মই রাষ্ট্রে ও রাজনীতিতে আধিপত্য করে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জনশিক্ষার প্রসার এবং শিল্পায়নের পর থেকে সেখানে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে এসেছে, কারণ ব্যক্তির জীবনেও ধর্মের প্রভাব কমে গেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অবশ্য অনেক বিকার লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে এখন ধনপূজা, আণবিক শস্ত্রপূজা এবং যোনিপূজা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্মে উদাসীনতার সঙ্গে সঙ্গে এসব নৈতিক এবং

আদর্শগত বিকারও বর্জনীয়। প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্র, সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক বলগাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে ধর্মের ক্ষয় হয়েছে বলেই পাশ্চাত্য সমাজে এসব বিকার দেখা দিয়েছে। ধর্মের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে নৈতিক বা আদর্শগত বিকারের কোন অনিবার্য কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রবল ধর্মবিশ্বাসের যুগে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা ছিল বর্তমান কালের চেয়ে অনেক বেশি নীতিহীন, আদর্শহীন এবং গুরুতর অসাম্য ও স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দেশে এক দিকে আছে ধর্মীয় রাজনীতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থা, শিল্পায়নের মন্থরতা, অশিক্ষার অন্ধকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুন্নত অবস্থা, আর ক্রমবর্ধমান বেকারি। সমাজতন্ত্রের সাংবিধানিক আদর্শও আশির দশক থেকেই বর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আত্মনির্ভরতা ও স্বকীয়তার আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ প্রত্যক্ষভাবে নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শক্তি এবং ধনতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শের এই সার্বিক অবক্ষয়, গতিশীলতার সামগ্রিক অভাব, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং বেকারির মধ্যে অবশ্যম্ভাবী রূপেই জন্ম নিয়েছে মৌলবাদী ধর্মীয় রাজনীতি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ই মৌলবাদী রাজনীতির জন্মভূমি।

একথা মনে করলে ভুল হবে যে এদেশে মৌলবাদী রাজনীতির ব্যাপক সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের জন্য শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল এবং শক্তিগুলিই দায়ী। এ ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলির ভূমিকাও কম নয়। রাতের অন্ধকারে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদে রামলালার মূর্তি স্থাপন পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দুষ্কৃতীরা করে থাকতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেই মসজিদের দরজা খুলে সেখানে নিয়মিত রামলালার দর্শন ও পুজোর ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলই করেছে। ১৯৮৮ সালে "জয় শ্রীরাম" ধ্বনি সহ বাবরি মসজিদের খুব কাছে রামমন্দিরের শিলান্যাস করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ অথবা শিবসেনা। করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তারপর সরকারি দূরদর্শনে দীর্ঘকাল ধরে অনৈতিহাসিক ও ভক্তিবাদী *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* বিকৃত অবতার কাহিনী প্রচার করে গণমানসে ধর্মান্ধতা এবং মৌলবাদী রাজনীতির ইন্ধন জুগিয়েছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার। ধর্মান্ধ ও প্রকাশ্যভাবে

মৌলবাদী যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি এতকাল ভারতীয় রাজনীতির প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিল, এই পরিস্থিতিতে তারা সুযোগ বুঝে ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের ফন্দিতে বেপরোয়া তান্ডবে মেতে ওঠে। ধর্মাসুরের রথযাত্রা, হিন্দী বলয়ে কপিসেনার রাজনৈতিক অভিযান, এবং শেষ পর্যন্ত অসুর বাহিনীর বর্বর উল্লাসে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস এই ধর্মীয় রাজনীতিরই অনিবার্য পরিণাম। কিন্তু এখানেও মনে রাখা দরকার যে বাস্তবে বাবরি মসজিদ রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে নরসিংহ রাও পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী, যে নরসিংহ রাও অবশ্যই সনাতন হিন্দুধর্মে গভীরভাবে আসক্ত।

অর্থাৎ যে হিন্দু ধর্মীয় রাজনীতি স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়া থেকেই এদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে ধর্মীয় রাজনীতিই আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সুবিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুত্ব ও রামরাজ্যবাদী দলগুলি সাম্প্রতিক মৌলবাদী রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা অবলম্বন করলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে এদেশে হিন্দু ধর্মীয় রাজনীতির শেকড় ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থার অনেক গভীরে প্রোথিত আছে।

এ প্রসঙ্গে অনেকেই এদেশের মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী রাজনীতির কথা টেনে আনেন। ঐতিহাসিক সত্য এই যে সব ধর্মের প্রথম যুগের মতোই ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রথম থেকেই ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে ছিল। কোরান শরিফ এবং হাদিস শরিফেও ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা হয়নি। মধ্যযুগের পর থেকে ইসলাম ধর্মে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক অথবা বৌদ্ধিক নবজাগরণ হয়নি। আধুনিক পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কোন ব্যাপক ধর্মসংস্কারও হয়নি। কামাল পাশার তুরস্কে, নাসেরের মিশরে, সুকার্নোর ইন্দোনেশিয়ায়, মুজিবের বাংলাদেশে এবং সাদ্দাম হোসেনের ইরাকে রাজনীতিতে ধর্মান্ধতার কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। কিন্তু সৌদি আরব, ইরান ও পাকিস্তান সহ অনেক ইসলামপ্রধান দেশে বর্তমান রাজনীতি ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির এটি একটি বড় দুর্বলতা। তাছাড়া ধর্ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক কিংবা অন্য ধরনের সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজপতিরা সহ্য করতে অপারগ। অথচ এই অসহিষ্ণুতার মধ্যেও কিছু সুবিধাবাদের ছাপ স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন কোন মুসলিম লেখক পরোক্ষভাবে সাহিত্যিক তরিকায়, আর বিদ্রোহী নারী তসলিমা নাসরিন সরাসরি অসীম

সাহসিকতায় ইসলামের যেটুকু সমালোচনা করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর এবং তীব্র ইসলামের এবং হজরত মহম্মদের সমালোচনা আছে এডওয়ার্ড গিবনের বিশ্ববিখ্যাত *Decline and Fall of the Roman Empire* গ্রন্থে, অথবা এইচ.জি.ওয়েলসের *Outline of History* গ্রন্থে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ, এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত এ ধরনের অন্য আরও অনেক ইসলাম বিরোধী গ্রন্থ নিয়ে ইসলামপ্রধান দেশগুলিতে কোন রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা বা সামাজিক বিক্ষোভ দেখা যায় না। কারণ সে কাজ অনেক বেশি কঠিন। এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ এই যে অধিকাংশ ইসলামপ্রধান দেশে সামাজিক সাম্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্তমান থাকলেও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অসাম্য অত্যন্ত প্রকট। সেসব দেশে এখনও প্রধানত রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত আছে। আর দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের ধর্মান্ধতাকে শক্তিশালী করে শাসক শ্রেণী নিজেদের শোষণ-শাসনকে চিরায়ত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শাসক শ্রেণী দ্বারা ধর্ম উৎসাহিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে যারা সংখ্যালঘু, তারা সব দেশেই ধর্মীয় একতার মধ্যে সুরক্ষার সন্ধান করে এসেছে। এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের মাধ্যমে সুরক্ষার চেষ্টা অনিবার্যভাবেই শক্তিশালী হয়েছে। একথাও জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মীয় রাজনীতির পক্ষপাতী, এ ধারণা কট্টরপন্থী হিন্দুদের বিদ্বেষভাবপ্রসূত কল্পনা মাত্র। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের এক বিরাট অংশ রাজনীতিতে ধর্মহীন কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের শরিক। বিভিন্ন নির্বাচনের ফলাফলও মুসলমানদের মধ্যে মূলত ধর্মীয় রাজনীতির সাক্ষ্য দেয় না। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রত্যক্ষ সত্য যে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম মৌলবাদের চেয়ে হিন্দু মৌলবাদের দাপট অনেক বেশি। আর ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের মৌলবাদী রাজনীতি যেকোন দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মৌলবাদী রাজনীতির চেয়ে সামগ্রিকভাবে অনেক বেশি ভয়াবহ ও মারাত্মক।

একথা অনস্বীকার্য যে ভারতে যে ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাতে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর আনুগত্য এবং সমর্থন লাভের চেষ্টা করে, আর সে মতলবে বিভিন্ন ধর্ম

গোষ্ঠীদের মধ্যে বিভেদ বাঁচিয়ে রেখে কৌশলে নিজেদের ভোট ব্যাংক বাড়াবার চেষ্টা করে। ইন্দিরা গান্ধী যখন যত্রতত্র মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতে আর গুরু-বাবা-সাধু সন্দর্শনে যেতেন, অথবা যখন একজন তথাকথিত ব্রহ্মচারীকে তার রাজনৈতিক আশ্রয়ে নিজ শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে দিয়েছিলেন, তখন সম্ভবত তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস থেকে এসব করেননি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক সমর্থন এবং আনুগত্য লাভের মতলবে নিজ ধর্মীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবার জন্যই করেছেন। রাজীব গান্ধী যখন 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিল্যান্যাস করেন, তখন তিনিও একমাত্র ভোটের উদ্দিশেই এভাবে হিন্দু মৌলবাদকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওও অংশত একারণেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে উপযুক্ত সরকারি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেননি। সরাসরি হিন্দুত্ববাদী যেসব রাজনৈতিক দল *রামায়ণের* কল্পকাহিনীকে আশ্রয় করে হিন্দি বলয়ে ধর্মান্ধ হিন্দুদের দলে টেনেছে, আর আদিম বর্বরতায় ধ্বংস করেছে বাবরি মসজিদ, সেসব দলও ধর্মকে রাষ্ট্রশক্তি দখলের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারি দল ধর্মান্ধ মুসলমানদের রাজনৈতিক সমর্থন ও ভোটের আশায় মুসলিম মৌলবাদকে সমর্থন জানিয়েছে এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে মানবতামুখী করবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মানবিক রায়ের পরে নারীর উপর পুরুষের অন্যায় অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে শাসক দলের উদ্যোগে সংবিধান সংশোধন এই রাজনৈতিক অভিসন্ধির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এমনকি অনুসূচিত জাতি-উপজাতিদের প্রকৃত মুক্তির চেয়ে তাদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করবার প্রবণতাই বেশি লক্ষ করা যায়। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শূদ্র-অতিশূদ্র শ্রেণীর আর্থসামাজিক হীনস্থান হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক। এখানেও ধর্মের নৃশংসতাকে আঘাত না করে তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য ইস্তেমালের প্রবণতাই বেশি।

বৃহত্তর জাতীয় জীবনে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের এই রীতি স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র আকারেও সারা দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কলকাতা শহরে পাড়ায় পাড়ায় যত ক্লাব আছে, তারাই দুর্গাপুজো-কালীপুজো সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান সংঘবদ্ধ উদ্যোক্তা। আর অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এসব ক্লাব এবং তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সক্রিয় সমর্থন করে থাকে। দলীয় নেতারা এসব ক্লাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে

যুক্ত থেকে সর্বত্র দুর্গাপুজো, কালীপুজো প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে, এবং জনসাধারণের উপর প্রচন্ড অত্যাচার চালিয়ে যেভাবে এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পান্ডারা জোর করে চাঁদা আদায় করে তারও সরব অথবা নীরব সমর্থন করে থাকে। কারণ নির্বাচনের সময় আবার ক্লাবে ক্লাবে বারোয়ারি পুজোর পেশিবহুল ভক্তজনেরাই মাথাপিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাজনৈতিক দলের 'স্বেচ্ছাসেবক' এবং অ্যাকশন স্কোয়াডে রূপান্তরিত হয়। যেসব বামপন্থী রাজনৈতিক দল আদর্শগত কারণে এসব বারো মাসে তেরো পার্বণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে না, তারাও কিন্তু সম্ভবত জনসমর্থন হারাবার আশংকায় সরাসরি এই ব্যাপক অপসংস্কৃতি ও গণপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অপারগ। তেমনই ভারতের অন্যত্র রামসীতা পুজো, হনুমান পুজো, গণেশ পুজো সহ অগণিত দেবদেবীর পুজো আরাধনায় বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান নেতারা প্রায়শই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এভাবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতিক পয়গম্বরেরা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশরম ভাবে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় রাজনীতির প্রাবল্যের জন্য শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগোষ্ঠীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কমাতে হলে বর্তমানে প্রচলিত রাজনীতির ব্যপক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বর্তমান কালের বহুদলীয় রাজনীতির ব্যবস্থায় বহুসংখ্যক মানুষের উপর ব্যক্তিগত প্রভুত্ব অর্জন, চোরাপথে হঠাৎ বড়লোক হওয়া, আর অনেক ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাই বেশির ভাগ রাজনীতিকের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অর্থবল ও বাহুবলের সাহায্যে নির্বাচন জয়ই বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের আসল পরিচয়। একদিকে বৃহৎ পুঁজিপতি, বৃহৎ ভূস্বামী, ফাটকাবাজারের এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অসংখ্য দালাল, সমাজবিরোধী মাফিয়া চক্র, মদ্য ব্যবসায়ী, চোরাচালানকারী, বিল্ডিং প্রমোটার, সাট্টা ডন ও তাদের বিশাল মাস্তান বাহিনী এবং বেশ্যাপল্লীর দালালেরা নিজেদের বিত্তবল ও বাহুবলে বারোমাস আদর্শহীন ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলির এবং তাদের নেতাদের দেখভাল করে। আর ভোটের সময় তারাই 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী সাপ্লাই করে। আবার এই অসুর বাহিনীই মওকা বুঝে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে রাজনীতিকে বিষিয়ে তোলে। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রশ্রেণীর উপর সংখ্যালঘু আর্যশ্রেণীর প্রভুত্ব চিরায়ত হয়ে থাকে, আর এই প্রভুত্ব ও শোষণ-শাসনকে চিরস্থায়ী করতে আর্য শাসক

শ্রেণী নির্লজ্জভাবে নানা কৌশলে ধর্মকে ব্যবহার করে। অতএব রাজনীতিকে ধর্ম থেকে মুক্ত করতে হলে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে এমন নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে অসুর শক্তির বিত্তবল এবং বাহুবল ছাড়াই জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে।

কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে মানব সমাজের মধ্যে আদিম ধর্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞান ও মানবতা বিরোধী ধর্মান্ধতা বর্তমান আছে বলেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং তাদের পেছনে অশুভ শক্তিগুলি ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে। অতএব শেষ পর্যন্ত মানুষের ধর্মবিশ্বাস শিথিল না হলে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অথবা ধর্মে রাজনীতির প্রভাব ক্ষীণ হবার আশা কম। বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতার অবসান এবং ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতাও তাই অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা রাজনীতিতে ধর্মের আসুরিক প্রয়োগ রোধ করা সম্ভব হবে না।

প্রধানত প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে নিরাপত্তার অভাব বশতই মানুষের ধর্মের প্রয়োজন হয়। শৈশবে মানুষ সামগ্রিক অনিরাপত্তা হেতু নিজ সুরক্ষার জন্য মা-বাবার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যখন তার সামাজিক পরিবেশে (কখনও বা প্রাকৃতিক পরিবেশে) নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে, তখন বৃদ্ধ অথবা মৃত মা-বাবা তাকে সুরক্ষা দিতে পারে না। তাই সে শৈশবে গঠিত মানসিকতা অনুযায়ী মা-বাবার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপিতা কিংবা বিশ্বমাতার সন্ধান করে আর হাতের কাছে পাওয়া গুরু-বাবা-পীরদের 'অলৌকিক' শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ধূর্তভন্ড ধর্মবণিকেরা মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এমন এক সর্বশক্তিমান বিচারক ঈশ্বরের চরিত্র সৃষ্টি করে, যিনি মোল্লা-পুরোহিতদের কথা না শুনলে সব মানুষকে ভয়ানক নরকে নিক্ষেপ করেন। তাছাড়া এই ধর্মব্যবসায়ীরা আত্মা, পরজন্ম, স্বর্গনরকের আশা-আতঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করে, তাদের রচিত ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে অসংখ্য সামাজিক বিধান জনসাধারণের উপরে চাপিয়ে দিয়ে, আর পুজোপার্বণ, প্রার্থনা-উপাসনা, মন্তরতন্তর, দানদক্ষিণার মাধ্যমে আমজনতার পিঠে চেপে বসে। ধর্মবণিকদের দ্বারা চিত্রিত ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত রূপ-অরূপ এবং ধর্মীয় সামাজিক বিধানগুলি পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই জন্মগতভাবে পরিবারের মধ্য থেকে আপন করে নিতে বাধ্য হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বেছে নিতে পারে না। অথচ

এহেন ধর্ম নিয়েই দেশে দেশে অবিরত সংঘাত ও মৌলবাদী রাজনীতি চলছে। যেহেতু পৃথিবীর কোন দেশেই আজ পর্যন্ত এমন কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি যেখানে মানুষের সামগ্রিক নিরাপত্তা বোধ জন্মাতে পারে, অতএব অদূর ভবিষ্যতে কোন দেশেই মানুষের ধর্মবিশ্বাস একেবারে চলে যাবার সম্ভবনা নেই। কিন্তু দ্রুত শিল্পায়ন ও সামগ্রিক আর্থিক বিকাশ, সর্বজনীন শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে ক্রমশ পুজো-উপাসনা, মন্তরতন্তর থেকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করবে। তখন মানুষ পরলোকের চেয়ে পৃথিবীকে, ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞানকে বেশি ভালোবাসতে শিখবে। মানুষ বুঝবে যে মহাবিশ্বের পেছনে যদি কোন অকল্পনীয় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাকেও একদিন বিজ্ঞানের সাহায্যেই জানা যাবে, ধর্মের সাহায্যে নয়। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারও তখন পর্যবসিত হবে অতীত ইতিহাসে। ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতি অধিষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান ও মানবতার আদর্শে।

৭

ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধর্মী দলন

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান রাজনৈতিক দলটি তার নিজস্ব হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ, নীতি ও কার্যক্রম সরকারি ভাবে দেশের উপর পুরোপুরি চাপিয়ে দিতে পারেনি। কারণ জোট সরকারের অন্য শরিক দলগুলির সকলেই এসবের সমর্থক নয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরি ব্যবহার করে, এবং হিন্দুত্ববাদী গণসংগঠনগুলিকে বেসরকারি হাতিয়ার করে সরাসরি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সাময়িক ভাবে কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই যে এ কারণে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ বা কার্যক্রম বর্জন করা হয়েছে। এমনকি সাময়িক ভাবেও তা করা হয়নি। এই নিবন্ধে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে অন্তত দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দুরাষ্ট্রের কার্যক্রম ফ্যাসিবাদী তরিকায় সীমিত রাজনৈতিক সুযোগের মধ্যেও যথাসাধ্য চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটি উদাহরণ কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি, যা পরিচালিত হয় কট্টর হিন্দুত্ববাদী তিলকধারী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মুরলী মনোহর জোশীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে। আর দ্বিতীয়টি হলো কুপরিকল্পিত দেশব্যাপী বিধর্মী দলন। যার বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং নিয়ন্তা সংঘ পরিবারের মৌলবাদী গণসংগঠনগুলি। অবশ্যই কেন্দ্রীয় জোট সরকারের প্রধান শরিকের রাজনৈতিক পৃষ্ঠবলে।

উনিশ শতকে যখন এদেশে প্রথম সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তখন হিন্দু সমাজপতিদের একাংশ ধর্মহীন শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সক্রিয় সমর্থনে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজে ধর্মহীন শিক্ষাই প্রবর্তিত হয়েছিল। ডেরোজিওর বৈপ্লবিক ভূমিকা এই পটভূমিতেই সম্ভব হয়েছিল। যদিও ডেরোজিওর পদচ্যুতি প্রমাণ করে যে হিন্দু সমাজপতিদের ক্ষমতা তখনও খর্ব হয়নি, তথাপি সরকারি

উদ্যোগে এবং নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় শিক্ষাকে বাদ দিয়েই গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও এই ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিন্তাশীল মানুষেরা কোনও তৎপরতা দেখাননি। স্বাধীন ভারতেও এতোকাল ধর্মহীন সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সরকারি শিক্ষা নীতিও এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নাতীত ধরে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বে বর্তমান জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পর থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাবার কুপরিকল্পিত চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১৯১১ সালে ক্ষমতা লাভের অল্প পরেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মুরলী মনোহর জোশী সব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডাকেন। সেই সম্মেলনে তিনি "বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ" শীর্ষক নয়া শিক্ষানীতির একটি খসড়া দলিল উপস্থাপিত করেন। সরস্বতী বন্দনা দিয়ে সম্মেলনটি আরম্ভ করবার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিবাদের ফলে। পরবর্তী কালে জানা যায় যে এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞেরা সংঘ পরিবারের সদস্য এবং হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তা। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সহ উপস্থিত সংঘ পরিবারের সকলেই এই খসড়া দলিল সমর্থন করেন। সম্মেলনের মধ্য থেকেই অবশ্য সংঘ পরিবারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কয়েকটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এই নয়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেন। তারপর সারা দেশে মৌলবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীরা এই দলিলের বিরোধিতায় তৎপর হন। বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাময়িক ভাবে এই নয়া শিক্ষানীতি সরাসরি চালু করা থেকে পিছিয়ে আসে। কিন্তু এটাই ছিল এদেশের শিক্ষানীতিকে হিন্দুধর্মীয় রূপ দেবার উদ্দেশ্যে বিজেপির প্রথম প্রয়াস, যা শুধুমাত্র উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ও সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। অতএব এই খসড়া দলিলে কি প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ভালো ভাবে বোঝা প্রয়োজন।

অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে খসড়া দলিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মনির্বিশেষে সব ছাত্রের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য চারটি নূতন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে দেশের চার প্রান্তে। কারিগরি সহ উচ্চশিক্ষার সব শাখায় বেদ ও উপনিষদ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে সব ধর্মের মানুষের জন্য। যোগ শিক্ষা সর্বস্তরে এবং সব শাখায় বাধ্যতামূলক করা হবে। সর্বস্তরের সব শিক্ষাকেই ভারতীয়ত্ব, জাতীয়তাবাদ এবং আধ্যাত্মিকতা

মণ্ডিত করে তোলা হবে। এই খসড়া শিক্ষানীতি শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত না হলেও প্রায় সংগে সংগেই উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকার রাজ্যের সব সরকারি স্কুলে সরস্বতী বন্দনা এবং 'বন্দেমাতরম' সংগীত সব ধর্মের ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা আপত্তি করায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন যে যেসব মুসলিম ছাত্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে আপত্তি আছে, তারা যেন সরকারি স্কুল ছেড়ে দিয়ে মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদের মুখে, আর চার রাজ্যে তখন আসন্ন উপনির্বাচনে ভোট হারাবার ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই আদেশ বাতিল করবার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকারের উপর চাপ দেয়। ফলে উত্তর প্রদেশ সরকার সাময়িক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুত্ব চালু করবার এই কার্যক্রম স্থগিত রাখে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া শিক্ষা দলিল এবং বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশ সরকারের উদ্যোগ থেকে তাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

সরস্বতী পুরাণকল্পিত হিন্দু দেবী মাত্র। তার বন্দনার ফলে কিশোর ও তরুণদের যুক্তিবিরোধী পৌরাণিক হিন্দুধর্মে দীক্ষা হলেও এদেশে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া প্রাচীন লোকায়ত দর্শন, সাংখ্য-যোগ দর্শন, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতিতে দেবদেবীদের বন্দনার কোনও স্থান ছিল না। গুপ্তযুগের আগে পর্যন্ত এদেশে মূর্তিপুজোর প্রচলনও ছিল না। আধুনিক যুগেও ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, বিশুদ্ধ বেদান্তবাদীরা, জোতিবা ফুলে, বাবা সাহেব আমবেডকর প্রমুখ শূদ্রনেতা ও তাদের অনুগামীরা, পেরিয়ার রামস্বামীর নেতৃত্বে দক্ষিণের দ্রাবিড় আন্দোলন, এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক বিজ্ঞানমনস্ক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিমানুষ দেবদেবী বন্দনার বিরোধী ছিলেন এবং আছেন। খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তো কথাই নেই। বিশেষত ইসলাম ধর্মে অংশীবাদের কোনও স্থান নেই। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও কল্পিত দেবদেবীর বন্দনা ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর।

একথা সত্য যে স্বাধীনতা আন্দোলনে 'বন্দেমাতরম্' সংগীত বা ধ্বনি দেশমাতৃকা বন্দনা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এও সমান সত্য যে স্বাধীনতা আন্দোলনে এ ধরনের হিন্দুধর্মীয় লক্ষণগুলির অনুপ্রবেশই ছিল এ আন্দোলন থেকে মুসলিম জনতার এক বড় অংশের দূরে সরে যাবার অন্যতম কারণ। আর এ ধ্বনি হিন্দুরা যে শুধু ইংরেজ বিরোধিতায় ব্যবহার করেছে তাই নয়। হিন্দু-মুসলিম দাংগার সময় মুসলিম

নিধনেও ব্যবহার করেছে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের যে *আনন্দমঠ* উপন্যাস 'বন্দেমাতরম্'-এর উৎস, সেখানে যেভাবে জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা রূপে দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বন্দনা করা হয়েছে, তার মধ্যেও ধর্মভিত্তিক হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অথচ ইসলাম ধর্মে দেশের মাটিকে, অথবা কোনও মানুষ বা অন্য প্রাণীকে বন্দনা গর্হিত এবং ধর্মবিরোধী কাজ। সে কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় সংগঠনগুলি মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা বাধ্যতামূলক সরস্বতী বন্দনা এবং 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

বেদ ও উপনিষদ পাঠ্য তালিকায় আবশ্যিক করা সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। প্রতিটি ভারতীয়েরই এদেশের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বেদ-উপনিষদ একমাত্র হিন্দুদেরই ধর্মগ্রন্থ, অন্য ধর্মের মানুষের নয়। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভারতে লেকায়ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও জৈন দর্শন সহ বেশ কয়েকটি বেদবিরোধী এবং লোকপ্রিয় বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক প্রবাহ বর্তমান ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চরক ও সুশ্রুতের আয়ুর্বেদশাস্ত্র, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*, বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* প্রভৃতি জগৎ ও জীবনমুখী প্রাচীন মহাগ্রন্থগুলির মধ্যে বেদ-উপনিষদের ধর্মীয় প্রভাব ছিল না। অতএব বেদ-উপনিষদ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে হিন্দু ছাত্রেরাও ভারতীয় ঐতিহ্যের শুধুমাত্র একপেশে এবং বিকৃত পরিচয়ই পাবে। বেদ, উপনিষদ, কোরান ও বাইবেল সহ সব ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলির সংগে পরিচয় থাকা সুরুচির পরিচয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থ অন্য সব ধর্মের ছাত্রকে জোর করে পড়তে এবং সে বিষয়ে পরীক্ষা পাশ করতে বাধ্য করার পিছনে কুযুক্তি এবং দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া ভার।

সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যায় যে জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ও বিশ্বায়নের যুগে কিশোর ও তরুণদের শিক্ষায় এমন সব বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাতে বিশ্বের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ছাত্রেরা পিছিয়ে না পড়ে। সে কারণে ইতিমধ্যেই স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচী গুরুভার হয়ে পড়েছে। তার উপর সংস্কৃতের মতো একটি অপ্রচলিত এবং দুরূহ ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে বিশ্বমানে ভারতীয় শিক্ষার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রায় সবই অনুবাদে সহজলভ্য। অতএব প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে আগ্রহীরা সহজেই তা পড়তে পারেন। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সংস্কৃত অবশ্যই স্কুল-কলেজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নয়। তার

চেয়ে আরও ভালো করে মাতৃভাষা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অনেক বেশি।

তাছাড়া বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি যে সব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পঠনপাঠনের জন্য সকলের উপর সংস্কৃত চাপাতে সংঘ পরিবার উদ্যোগী হয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক। এমনকি মধ্যযুগ পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যও ছিল মূলত *রামায়ণ-মহাভারতের* ধর্মকাহিনী নিয়ে রচিত। এ কারণেই গোঁড়া হিন্দুরা সংস্কৃতকে 'দেবভাষা' বলে থাকেন। কিন্তু মুসলিমরা না মানেন দেবতা, আর না তারা বাধ্য হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে। অতএব মুসলিম ছাত্রদের সংস্কৃত পড়তে বাধ্য করা ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক অত্যাচারের সমান।

ধর্মনির্বিশেষে আবশ্যিক যোগশিক্ষা সম্বন্ধে বলা যায় যে শুধুমাত্র ব্যায়াম হিসেবে যোগাভ্যাসে কোনও ধর্মীয় আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু যোগ শুধুমাত্র ব্যায়াম নয়। হিন্দুধর্মে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের উপায় হিসেবে নির্ধারিত। আর এই বিশেষ ধর্মতত্ত্ব হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কোনও ধর্মে নেই। সম্ভবত শরীর চর্চার নামে অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের মগজে এভাবে হিন্দুধর্ম প্রবেশ করানোই সংঘ পরিবারের উদ্দেশ্য। তাছাড়া সাধারণভাবে খেলাধুলো এবং শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করবার যুক্তি থাকলেও একটি বিশেষ ধরনের ব্যায়াম সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা গণতন্ত্রবিরোধী, বিশেষত যে ব্যায়ামের পেছনে একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মতত্ত্বের অবস্থান অনস্বীকার্য।

শিক্ষানীতি সংক্রান্ত উল্লিখিত খসড়া দলিলে নারীশিক্ষা সম্বন্ধেও একটি মৌলবাদী প্রস্তাব ছিল। সেটি এই যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তরে নারীদের বিশেষ করে হাউসকিপিং বা ঘরের কাজের শিক্ষা দেওয়া হবে। অর্থাৎ *মনুস্মৃতি* প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির অনুশাসনে নারীকে যেমন পুরুষ প্রভুর অধীন এবং স্বাতন্ত্র্যহীন গৃহদাসী করে রাখা হয়েছিল, একবিংশ শতাব্দীতে সংঘ পরিবার ভারতীয় নারীকে মূলত সে পারিবারিক তথা আর্থসামাজিক অবস্থানেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নারীর পৃথিবী ঘরে আর পুরুষের পৃথিবী বাইরে, এই সামাজিক আদর্শ বর্তমান যুগে একমাত্র মৌলবাদী ধর্মাসুরদেরই ভূষণ হতে পারে। আফগানিস্তানের তালিবানি শিক্ষানীতিতে ঘটেছে যার চরম প্রকাশ।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে বৃহত্তর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন আছে। এদেশে প্রাচীন কালেও যেমন বহুসংখ্যক ধর্মবিরোধী মানুষ ছিলেন, তেমনি বর্তমানেও আছেন। আমি যদি কোনও ধর্মেই বিশ্বাস না করি, তবে আমার সন্তানকে স্কুলে জোর করে সরস্বতী

বন্দনা বা 'বন্দেমাতরম্' বা বেদ-উপনিষদের ধর্মে দীক্ষিত করা হবে কেন? আমি কেন শৈশবেই তার মগজে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে এক বিশেষ ধর্মান্ধতা ঢুকিয়ে দিতে সম্মত হবো? অজ্ঞান শিশুর উপরে জোর করে একটা বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় আচার-বিচার চাপিয়ে দেওয়া কি ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিকাশ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপন্থী নয়?

'১৯১১ সালের প্রস্তাবিত নয়া শিক্ষানীতি চালু করতে সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার হিন্দু জাতীয়তাবাদী শিক্ষামন্ত্রী তারপর থেকে চুপ করে বসে থাকেনি। শিক্ষামন্ত্রীর হাতে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবার একটি বড় অস্ত্র আছে। সে অস্ত্রটি এই যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বা ইউজিসি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর ফিলসফিক্যাল রিসার্চ প্রভৃতি বহুসংখ্যক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরাসরি তার অধীনে এবং নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়, আর সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যেরা সকলেই সরাসরি শিক্ষামন্ত্রী দ্বারা মনোনীত হয়ে থাকেন। এই মনোনয়নের সুযোগ গ্রহণ করে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটিতে ইতিমধ্যেই সংঘ পরিবারের সদস্য বা সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তুলেছেন। তাছাড়া এই উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সম্পূর্ণই কেন্দ্রীয় শিক্ষা বা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অনুদান কমিয়ে দিয়ে, একেবারে বন্ধ করিয়ে দিয়ে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে বাড়িয়ে দিয়ে ধর্মহীন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে সংকুচিত এবং হিন্দুধর্মীয় শিক্ষা ও গবেষণাকে বাড়িয়ে তুলবার অসুস্থ প্রচেষ্টা নিরন্তর বেড়ে চলেছে।

এই অশুভ উদ্যোগের সব উদাহরণ জনসাধারণের জানা না থাকলেও কয়েকটি উদাহরণ সম্প্রতি চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমটি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টারিক্যাল রিসার্চের হিন্দুত্ববাদী নূতন কর্মাধ্যক্ষ এবং নবগঠিত পরিচালন সমিতি দুজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ দ্বারা রচিত স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে নূতন করে এই ইতিহাস রচনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আরেকটি উদাহরণ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর হিন্দুত্ববাদী নূতন সভাপতি এবং নবগঠিত কর্মসমিতি দ্বারা বারাণসীর গান্ধীয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্টাডিজের অনুদান বন্ধ করা। এ গবেষণা সংস্থাটি জয়প্রকাশ নারায়ণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় উদাহরণ

কলকাতায় অবস্থিত সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেসের অনুদান অনেক কমিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে অচল করে দেবার প্রচেষ্টা। এই সুপরিচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির দোষ এই যে এখানকার বিশিষ্ট গবেষকবৃন্দের অধিকাংশ বামপন্থী হিসেবে পরিচিত। এ জাতীয় আরও অনেকগুলি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে ধর্মহীন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার কণ্ঠরোধ করে হিন্দুধর্মীয় শিক্ষা ও গবেষণা চালু করবার প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এসবের চেয়েও বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষামন্ত্রী দ্বারা মনোনীত হিন্দত্ববাদী সদস্যদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির পরিচালন ব্যবস্থায় গরিষ্ঠতা অর্জন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। কারণ ইউজিসি ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে, নূতন নূতন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে, এবং নূতন নূতন পাঠ্য বিষয় চালু করার মাধ্যমে। ইউজিসির উপর শিক্ষামন্ত্রী এবং তার দ্বারা মনোনীত সদস্যদের এতোখানি কর্তৃত্ব আছে যে তারা সংঘবদ্ধ এবং পরিকল্পিত ভাবে সচেষ্ট হলে ধীরে ধীরে পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থারই দিক পরিবর্তন করে দিতে পারে। আর এ কাজই মনে হয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। শুধু একটি বিশেষ উদাহরণ এখানে আমরা উল্লেখ করবো।

সম্প্রতি ইউজিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্র, অর্থাৎ কোষ্ঠী বিচার, হাত দেখা, রাশিফল গণনা ইত্যাদি বিষয়ে তারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পাঠক্রম চালু করবে। এর আগেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তথাকথিত বৈদিক গণিত স্কুলের উপরের ক্লাসে পড়ানো আরম্ভ হয়েছিল। এবার আরম্ভ হলো অ্যাস্ট্রলজি বা জ্যোতিষ বিদ্যায় অনার্স ডিগ্রি। পুরোহিতের পেশা অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, পুজোপার্বণ, এবং অন্নপ্রাশন থেকে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বিষয়েও অনার্স কোর্স এবং অনার্স ডিগ্রি চালু হলো। যা এতোকাল *পুরোহিত দর্পণ* এবং পঞ্জিকা প্রভৃতি দিয়ে চলে আসছিল। এই হচ্ছে আধুনিক উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুত্ববাদীদের ধারণা। আর এ ধারণা নিয়েই তারা আশা করে যে ভারতবর্ষ জ্ঞানবিজ্ঞানে সারা পৃথিবীর সংগে প্রতিযোগিতা করবে। হিন্দুত্ববাদীদের ঔদ্ধত্যে ভারতের মেধাশক্তি যে কোন্ মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে পরিচালিত হচ্ছে, মুক্তমনা চিন্তাশীল মানুষের কাছে তা কল্পনার অতীত।

সংবাদ অনুযায়ী ১৯১১ সালে বাধাপ্রাপ্ত বিজেপির মৌলবাদী শিক্ষানীতি কোনও না কোনও ভাবে আবার চালু করবার চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

১৩ অক্টোবর ২০০০ তারিখের দৈনিক *হিন্দুস্তান টাইমসের* সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার সর্বস্তরে আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধের নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রবর্তন করতে চলেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক নাকি এ সিদ্ধান্ত নীতিগত ভাবে গ্রহণ করেছে। এই পুনঃপ্রচেষ্টা আপাতত আবারও বাধাপ্রাপ্ত হবে বলেই মনে হয়। কিন্তু বার বার একই উদ্যোগ থেকে বোঝা যায়, সংঘ পরিবার যে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে এদেশে হিন্দু মৌলবাদী শিক্ষানীতি চালু করতে বদ্ধপরিকর, সেকথা সন্দেহাতীত। অপেক্ষা শুধু উপযুক্ত সুযোগ ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার।

জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্মান্ধতা এবং প্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কার লোপ পেয়ে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার হচ্ছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্তারা যেন গণমানসকে বিপরীত পথে পরিচালিত করতেই বদ্ধপরিকর। সংঘ পরিবারের হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ, গোহত্যা বিরোধী আন্দোলন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঐতিহাসিক বর্বরতা, এবং মথুরা ও কাশীতে মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণের অশুভ প্রয়াসের সামগ্রিক পটভূমিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। অনেক রাজনৈতিক বাধাবন্ধ সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে অনাবৃত কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি এই সত্যই প্রকাশ করছে যে বর্তমান সরকার হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে পরিকল্পিত পদক্ষেপ হিসেবেই হিন্দুধর্মীয় মৌলবাদী শিক্ষাব্যবস্থা রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে। অবিলম্বে জাগ্রত লোকশক্তির দুর্নিবার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এ শিক্ষানীতি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অনিবার্য ভাবেই টেনে নিয়ে যাবে মিথ্যা, অন্ধকার ও মৃত্যুর দিকে। সত্য, আলোক আর অমৃতের দিকে নয়।

এদিকে আবার রাষ্ট্রশক্তিতে আসীন হবার পর থেকে এদেশের মৌলবাদী শক্তিগুলি 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত ভাবে অহিন্দু জনগোষ্ঠীদের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। একগুচ্ছ মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপের পর তারা এখন খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীদের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ আরম্ভ করেছে। উপলক্ষ মিশনারিদের দ্বারা 'জোর করে' আদিবাসীদের খ্রিস্টান বানানো। বেশ কয়েকটি রাজ্যে মৌলবাদী ধর্মাসুরেরা খ্রিস্টান আদিবাসী ও মিশনারিদের উপর নরহত্যা, গৃহদাহ আর বলাৎকার সহ সব রকম বর্বর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, বিজেপি শাসিত গুজরাটের স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রক পুলিশ বিভাগের কাছে ১৯১১ সালের গোপন নির্দেশে খ্রিস্টানদের উপর এই বর্বর আক্রমণকে 'শ্রেণীসংগ্রাম' আখ্যা দিয়েছে, আর তিরিশের দশকে জার্মেনিতে নাৎসিদের ইহুদি নিধন অভিযানের অনুকরণে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা, কার্যকলাপ এবং মিশনারিদের 'শয়তানি' সহ সব রকম তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। যেহেতু একই মৌলবাদী দল তখন কেন্দ্রে এবং গুজরাটে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না যে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি এই বর্বরোচিত 'শ্রেণীসংগ্রামের' সহজ ও সক্রিয় অংশীদার।

প্রায় সর্বত্রই মৌলবাদীদের খ্রিস্টান বিরোধী তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের মূল লক্ষ্য আদিবাসী। এই আদিবাসীরা এদেশের সেই প্রাচীন ও আদি ভূমিপুত্র অনার্য, যারা আর্যদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিল, এবং আর্যদের বশ্যতা না মেনে চাতুবর্ণ্য রূপ পিরামিডের তলদেশে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের সংগে মিশে যেতে অস্বীকার করেছিল। এদের এক অংশ যুদ্ধ করতে করতে বনে অথবা পাহাড়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। আরেক অংশ অরণ্যে-পর্বতে চিরদিন শিকারী আর্যদের নাগালের বাইরে থেকে গেছে। কৃষিকার্য, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, নৃত্যগীত প্রভৃতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদন আর্যেরা এই অনার্য আদিবাসীদের কাছ থেকেই পেয়েছে। অথচ একলব্যের অংগুলি ছেদন, তথা পঞ্চপুত্রসহ নিষাদ জননীকে জীবন্ত দগ্ধ করা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এদেশের ভূমিপুত্র আদিবাসীরা মনুবাদী আর্য সভ্যতার মৃগয়ার লক্ষ্যবস্তুই রয়ে গেছে। বাণভট্টের *কাদম্বরী* সহ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে আদিবাসীরাও এদেশে চিরদিন দলিতদের মতোই অস্পৃশ্য রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর অসভ্য ও অপরাধী হিসেবে ঘৃণিত হয়ে নির্বাসিত হয়েছে মনুবাদী সমাজব্যবস্থার বাইরে। মিশনারিদের শয়তানি নয়, বহুযুগের শীলীভূত দুঃসহ অস্তিত্ব বিরহই আদিবাসীদের এক ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মূল কারণ। এক সময়ে মনুবাদী সভ্যতার এই অসহনীয় অত্যাচার ও শোষণই ছিল বহুসংখ্যক দলিত এবং আদিবাসী সমাজের মানুষের বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রধান ঐতিহাসিক কারণ। হিন্দুধর্ম দ্বারা অবমানবিক অতিশূদ্র স্তরে নির্বাসিত আদিবাসীদের মিশনারিরাই সর্বপ্রথম বলেছেন, তোমরাও মানুষ, সব মানুষের সমান হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার তোমাদেরও আছে।

একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এদেশের আদিবাসী সমাজ কোনদিনই আর্য সভ্যতা বা হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। যে জাতিভেদ প্রথাকে মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা হিন্দুধর্মের ভিত্তি রূপে বর্ণনা করেছেন, আদিবাসীরা প্রাচীন

কাল থেকে আজ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ বর্জন করে এসেছেন। নারীর যে জন্মগত পুরুষের অধীনতা মনুর বিধান, প্রাচীন কাল থেকে তার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত আদিবাসী সমাজে নারীর সার্বিক স্বাধীনতা। পারিবারিক ব্যবস্থা, বিবাহ প্রথা এবং সামাজিক আচার-বিচারেও আদিবাসী সমাজ হিন্দু সমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাচীন আর্যেরা, এবং মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজ আদিবাসীদের কাছ থেকে শিব, চন্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, বনবিবি প্রমুখ লোকায়ত দেবদেবী, তথা হোলি, চড়ক প্রভৃতি অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছে। কিন্তু আদিবাসী সমাজ হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মের উপাদান প্রায় কিছুই সংগ্রহ করেনি। তাছাড়া হিন্দুধর্ম সহ অন্যান্য সব বড় বড় ধর্মের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে, আদিবাসী ধর্মের সে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কখনো ছিল না, এখনো নেই। অতএব আদিবাসী জনজাতিদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে একথা বলা যায় না যে তারা হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

একই কারণে খ্রিস্টান আদিবাসীদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও হাস্যকর, কারণ তারা কোনকালেই হিন্দু ছিল না। তাছাড়া হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা কখনো সফল হয়নি এবং হতে পারে না, কারণ জাতিবর্ণভেদের কঠিন নিয়মে একমাত্র অতিশূদ্রদের মধ্যেই নবাগতদের স্থান হতে পারে, কোনও উচ্চবর্ণের মধ্যে নয়। আর হিন্দুধর্মে অতিশূদ্র হবার চেয়ে অন্য যে কোনও ধর্ম গ্রহণ করা ভাল। যদি ধর্মহীন থাকা সম্ভব না হয়। অতএব মিশনারিদের শয়তানি বা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নয়, দলিত ও আদিবাসী জনজাতির উপর মনুবাদী হিন্দুসমাজের নির্মম ঐতিহাসিক অত্যাচারই কিছুসংখ্যক অতিশূদ্রের ধর্মান্তর গ্রহণের মূল কারণ। আরও বেশিসংখ্যক অতিশূদ্র কেন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মধারা আদিবাসীদের জাগতিক উন্নতিতে সাহায্য করেছে। হিন্দুসমাজের ধনপতি, সমাজপতি আর বানিয়ারা ডিকু লুটেরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বনবাসী-পর্বতবাসী আদিবাসীদের সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করেছে। তাদের প্রায় ৯০ শতাংশ আজ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। তাদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন দিনমজুর। মিশনারিরা স্কুল-কলেজ স্থাপন করে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, চিকিৎসাকেন্দ্র-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে জীবিকা এবং বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতপক্ষে যত বহুসংখ্যক মানুষের জাগতিক উন্নতিতে মিশনারিরা সাহায্য করেছে, তাদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মাত্র খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। স্বামী

বিবেকানন্দ খ্রিস্টান মিশনারিদের আদর্শেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অখ্রিস্টান মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা অবশ্যই মিশনারিদের অন্যতম বাইবেল নির্দিষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই যে তারা যত লোকের উপকার করেছে তাদের প্রত্যেককেই খ্রিস্টান বানিয়েছে, অথবা যারা খ্রিস্টান হয়নি তাদের কোনও জাগতিক কল্যাণ করতে অস্বীকার করেছে। বলপ্রয়োগ বা শয়তানি-কারসাজির উদাহরণও বিরল, যদি তা আদৌ থেকে থাকে। বাস্তব ঘটনা এই যে চিরঅবহেলিত, অপমানিত, শোষিত ও নিষ্পেষিত অতিশূদ্রদের একাংশ তাদেরই ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে, যাদের কাছে পেয়েছে তারা মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি আর জাগতিক উন্নতির পথ।

মানুষের জীবনে কোনও ধর্মেরই প্রয়োজন আছে কিনা সেটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করেন যে ধর্মবিশ্বাস মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক। মানুষের ধর্ম জন্মলব্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা তাও বিচার্য। কারণ ধর্ম একটি আদর্শ মাত্র, জিন বা অংগপ্রত্যংগের মতো জন্মলব্ধ জৈবিক উপকরণ নয়। মানুষ যেমন যে কোনও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আদর্শকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ বা গ্রহণ করতে পারে, তেমনি ভাবে যে কোনও ধর্ম ত্যাগ বা গ্রহণ করবার, অথবা সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকবার অধিকারও প্রত্যেক মানুষের আছে। ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্রনীতি নির্মাণ ও রূপায়ণ শুধু মৌলবাদী ধর্মাসুরদের রাজনৈতিক অপকৌশল মাত্র।

বর্তমান পরিস্থিতিতে খ্রিস্টানদের উপর, বিশেষত আদিবাসী খ্রিস্টানদের উপর হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের সুপরিকল্পিত আক্রমণ নেমে আসার একটি বিশেষ রাজনৈতিক কারণ আছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাতে গিয়ে সব দিক থেকে ঘা খেয়ে বিজেপি সহ সংঘ পরিবার আপাতত কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে সংঘ পরিবারের বজ্রংবলীদের মনোবলে ভাটা পড়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ, এবং নানা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিশেষত খ্রিস্টান আদিবাসীরা সমাজের দুর্বলতম সর্বহারা শ্রেণীর অংশ এবং ব্যাপক প্রতিরোধে অক্ষম। অতএব তাদের উপর আক্রমণ হানলে এক দিকে ব্যাপক প্রতিরোধের সম্ভাবনা কম থাকবে। আবার অন্য দিকে হিন্দুরাষ্ট্রের বাহ্বাস্ফোট এবং গালবাদ্য অব্যাহত রেখে অসুরবাহিনীর মনোবল অক্ষুন্ন রাখা যাবে। এই মনে হয় সংঘ পরিবারের মূল স্ট্র্যাটেজি।

কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক লোকশক্তি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অচিরেই

মৌলবাদী ধর্মাসুরদের প্রতিরোধ করবে, এ গভীর প্রত্যয় নিয়েই আজ এদেশের সুস্থচিত্ত মানুষেরা দিন গুনছে। এক বিশেষ কদর্থে মৌলবাদী ধর্মাসুরেরা সত্যই শ্রেণীসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা সর্বহারা শ্রেণীর দুর্বলতম অংশ আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ভূমিপতি, ধনপতি ও বানিয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের বিপরীত শ্রেণীসংগ্রাম। ধর্মকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠবলে এই অশুভ শক্তি বিপরীত শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ করেছে। সর্বহারা আদিবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের লোকশক্তি এই বিপরীত শ্রেণীসংগ্রামকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন ধর্মমোহের উর্দ্ধে উঠে এদেশের বাস্তব আর্থসামাজিক কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধি। একদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার হিন্দুধর্মীয় রূপান্তর, আর অন্য দিকে সরকারের পৃষ্ঠবলে বেসরকারি মৌলবাদী গণসংগঠনের পরিচালনায় বিধর্মী দলন, হিন্দু মৌলবাদী শক্তির এই দ্বিমুখী অভিযান আজ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। এর মধ্যে যারা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা এবং ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক পদ্ধতির ইঙ্গিত না দেখতে পান, তাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর বলা যায় না। মৌলবাদী শক্তির প্রাধান্যে কেন্দ্রীয় সরকার কতকাল টিকে থাকবে বলা কঠিন। কিন্তু দুবছরেই তারা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে দৃঢ়তা এবং কুপরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজির পরিচয় দিয়েছে, সেটুকুই এদেশের গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে যথেষ্ট আশংকার কারণ। হিন্দু মৌলবাদী শক্তি দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন থাকলে মৌলবাদী এবং ফ্যাসিবাদী অসুর শক্তির কাছে এদেশের শুভশক্তির পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল। একমাত্র এদেশের জাগ্রত গণশক্তিই পারে সে ভয়াবহ সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করতে।

৮

চার্বাকবাদ ও আধুনিক ভারত

ভারতের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চার্বাকবাদ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল প্রবাহের বাইরে দাঁড়িয়ে চার্বাকবাদ এক বলিষ্ঠ এবং দুঃসাহসী বিজ্ঞানমনস্ক, জগৎ ও জীবনমুখী, সাম্যবাদী এবং মানবতাধর্মী সমাজ দর্শন প্রচার করেছিল, যা আধুনিক ভারতের পক্ষেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু নাস্তিকতা ও বস্তুবাদই চার্বাকবাদের বৈশিষ্ট্য, এই সাধারণ বিশ্বাস ভ্রান্ত। এক ধরনের বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদ বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সহ বেশ কয়েকটি প্রাচীন মতবাদেই লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া পুরাণ কস্‌সপ, মাক্‌খালি গোশালা, এবং আজীবিকদের প্রধান অজিত কেশকম্বলী প্রমুখ কয়েকজন চিন্তানায়ক নিরীশ্বরবাদ এবং বেদবিরোধী হিসেবে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মও মূলত বেদবিরোধী ধর্ম হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন নাস্তিকতাবাদ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে চার্বাকদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম, আর উল্লিখিত বেদবিরোধী চিন্তানায়কেরা মানুষের পার্থিব জীবনকে অনিবার্যভাবে দুঃখময় জ্ঞান করতেন, আর পার্থিব জীবন এবং জন্মমৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বার করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু চার্বাকবাদ প্রথম থেকেই মানুষের পার্থিব জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। দেহ ছাড়া আত্মাহীন, পরলোকহীন মহাবিশ্বে নিশ্চিত মরণের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে সৌন্দর্যময় করে তুলে সম্পূর্ণ উপভোগ করা, আর সে উদ্দেশ্যে জাতিবর্ণহীন মানবতাধর্মী সমসমাজ গড়ে তোলাই ছিল চার্বাকবাদের মূল কথা।

চার্বাকবাদ একই সঙ্গে লোকায়তবাদ এবং বৃহস্পতিবাদ নামেও পরিচিত।

চার্বাকবাদের উল্লেখ আছে এমন সমস্ত প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় গ্রন্থেই একই মতাদর্শের এই তিনটি নাম সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ এই যে বৃহস্পতি-চার্বাক-লোকায়ত দর্শনের কোনও মূল গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত সুঙ্গযুগ থেকে গুপ্তযুগের মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শাসকশ্রেণীর যৌথ উদ্যোগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় চার্বাকবাদের মৌলিক গ্রন্থগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। পরবর্তী কালে বেদ সমর্থক অন্যান্য সমস্ত দর্শন তথা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবক্তারা চার্বাকবাদ খন্ডনের উদ্দেশ্যে পূর্বপক্ষ হিসেবে এই মতবাদের যে উল্লেখ করেছেন, মূলত সে পরোক্ষ উৎস থেকেই চার্বাকবাদ সম্বন্ধে জানা যায়। জয়রাশি ভট্ট (সপ্তম শতাব্দী), হরিভদ্র সুরি (অষ্টম শতাব্দী), শঙ্করাচার্য (নবম শতাব্দী), জয়ন্ত ভট্ট (নবম-দশম শতাব্দী), এবং মাধবাচার্য (চতুর্দশ শতাব্দী) প্রমুখ যেসব দার্শনিকেরা বৃহস্পতি-চার্বাকবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউই কোনও মূল গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। অথচ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে প্রাচীন কালে বৃহস্পতি কিংবা চার্বাক প্রণীত 'লোকায়তশাস্ত্র' নামে একটি গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল।

কোটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক) যে বৃহস্পতিমতের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে চার্বাকবাদের গভীর মিল আছে। কৌটিল্য বৃহস্পতি মতের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন তা থেকে দেখা যায় যে বৃহস্পতি ছিলেন নাস্তিক ও বেদবিরোধী। বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে তিন বেদকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনু যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সে মতকে বর্জন করে বৃহস্পতি বলেছেন যে, পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে শুধু দুটি বিদ্যা আছে। প্রথমটি বার্তা বা অর্থনীতি, আর দ্বিতীয়টি দন্ডনীতি বা রাজনীতি ও প্রশাসন। কৌটিল্যের ভাষ্য অনুযায়ী বেদ সম্বন্ধে বৃহস্পতির বক্তব্য এই যে, মানুষের জীবন সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে (লোকযাত্রাবিদাঃ) তারা জানে যে তিন বেদ শুধু ভন্ডামির মুখোশ মাত্র (সম্বরণঃ)।

একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় কৃষ্ণ মিশ্রের (একাদশ শতক) *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে চার্বাক চরিত্রের মুখে। এখানে চার্বাক বলছেন, "বৎস, জানাসি দন্ডনীতিরেব বিদ্যা। তাত্রৈব বার্তান্তর্ভবতি। ধূর্তপ্রলাপস্ত্রয়ী।" — বৎস, দন্ডনীতিই বিদ্যা বলে জানবে। বার্তা তারই অন্তর্ভুক্ত। তিন বেদ ধূর্তদের প্রলাপ মাত্র। অতএব এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বৃহস্পতি ও চার্বাক ছিলেন একই সমাজ দর্শনের প্রবক্তা। জয়রাশি ভট্টের *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থকেও বৃহস্পতি মতের (এবং চার্বাক মতের) বিশ্লেষণ

হিসেবেই ধরা হয়। এই গ্রন্থে জয়রাশি অন্যান্য দর্শন যেসব পরোক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তা খন্ডন করে (চার্বাকবাদের মত) প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এই প্রসঙ্গে বারবার বৃহস্পতির নাম উল্লেখ করেছেন, তাকে সূত্রকার এবং দেবগুরু আখ্যা দিয়েছেন এবং কোথাও কোথাও তার সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি বলেছেন যে ধনসঞ্চয় এবং ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় কোনও দোষ নেই, আর এসব জাগতিক উদ্দেশ্যে সাধনের পরিপন্থী সমস্ত মতবাদকেই তিনি খন্ডন করেছেন। জয়রাশি গর্ব করে আরও বলেছেন যে, দেবগুরু বৃহস্পতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে তিনি অনেক নূতন যুক্তির অবতারণা করেছেন। হরিভদ্র সুরির *ষড়দর্শনসমুচ্চয়* গ্রন্থে লোকায়ত-চার্বাক দর্শনের টীকায় গুণরত্ন (চতুর্দশ শতাব্দী) বলেছেন ঃ "বৃহস্পতিপ্রণীতমতত্ত্বেন বার্হস্পত্যাশ্চেতি' — বৃহস্পতি দ্বারা প্রণীত বলে একে বার্হস্পত্য মতও বলা হয়ে থাকে।

মাধবাচার্যও তাঁর *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রথমেই বলেছেন যে বৃহস্পতি মতের অনুসারী নাস্তিক শিরোমণি চার্বাকের দ্বারা (বৃহস্পতিমতানুসারিনা নাস্তিকশিরোমণিনা চার্বাকেন) চার্বাকদর্শন প্রচারিত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে চার্বাকের এ চেষ্টার ফল দুরুচ্ছেদ্য (দুরুচ্ছেদং হি চার্বাকেন চেষ্টিতম)। মহাভারতের সর্বত্র কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রভৃতি দ্বারা বারংবার প্রশংসিত এবং উদ্ধৃত রাজনীতি-বিশারদ বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতি-লোকায়ত চার্বাকবাদের প্রতিষ্ঠাতা বৃহস্পতি এক ও অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

গুণরত্ন অবশ্য এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, চার্বাক কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, একটি সম্প্রদায়ের নাম। তিনি বলেছেন ঃ "চর্বন্তি ভক্ষয়ন্তি তত্ত্বতো ন মন্যতে পুণ্যপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতামিতি চার্বাকাঃ" — এরা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাপপুণ্য এবং পরোক্ষ প্রমাণ মানে না, এরা বস্তুবাদী, আর সব কিছু চর্বণ অর্থাৎ ভক্ষণ করে, তাই এদের নাম চার্বাক। কিন্তু চার্বাকের কোনও মূল গ্রন্থ না পেয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গুণরত্ন তাঁর কল্পনাকে অকারণে অনেক দূর প্রসারিত করেছেন বলেই মনে হয়। আরেকটি মত এই যে, ধর্মবিরোধী, বস্তুবাদী এবং ভোগবাদী তত্ত্বকথা শ্রুতিসুখকর বলেই 'চারুবাক' থেকে এই আদর্শে বিশ্বাসীদের নাম হয়েছে চার্বাক। কিন্তু উপরে মানুষ চার্বাকের যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও মহাভারতে তিন জায়গায় মানুষ চার্বাকের উল্লেখ আছে। বনপর্বে এক জায়গায় দ্রৌপদী নাস্তিকদের সমালোচনা করে তাদের চার্বাকপন্থী বলে অভিহিত

করেছেন। শল্যপর্বে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুর্যোধন পান্ডবদের দ্বারা অন্যায় যুদ্ধে সব কৌরব বীরদের মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত ভীম কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে তার নিধন সম্বন্ধে শোক করতে করতে বলছেন যে, এখন যদি বাগ্‌বিশারদ পরিব্রাজক চার্বাক এখানে উপস্থিত থাকতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বৈর নির্যাতনে এগিয়ে আসতেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে অগ্রসর হলে রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রশংসা এবং পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে থেকে একজন যুধিষ্ঠিরকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেন যে, অগণিত গুরু-জ্ঞাতি-বন্ধুকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করার চাইতে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুই ভালো। এ কথা শুনে যুধিষ্ঠির বিচলিত হলে উপস্থিত অন্য সব ব্রাহ্মণেরা বলে উঠলেন যে, এটা তাঁদের কথা নয়, দুর্যোধনের বন্ধু চার্বাক নামক রাক্ষস ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এ কথা বলেছে। এই বলে তাঁরা হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে চার্বাককে পিটিয়ে মেরে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের এই কাজের সমর্থন করে এক পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করে বললেন যে, ব্রাহ্মণেরা ভূতলস্থ দেবতা এবং সতত অর্চনীয়, আর তাঁদের অপমান করবার ফলেই আজ চার্বাক রাক্ষস ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হল। এই কাহিনী বেদবিরোধী, বর্ণভেদবিরোধী, মানবতাবাদী চার্বাকের হত্যার ঐতিহাসিক ঘটনার মহাকাব্যিক রূপ হওয়া অসম্ভব নয়।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত মনে হয় যে, বৃহস্পতি ও চার্বাক একই সমাজদর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। উভয়ের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যদি কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে ঐতিহাসিক মানুষ হবার সম্ভাবনা চার্বাকেরই বেশি। এমনও হতে পারে যে নিজ মতবাদকে মহিমান্বিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি তা পৌরাণিক দেবগুরু বৃহস্পতির নামে প্রচার করেছিলেন। পৌরাণিক *সূর্যপুত্র* মনুর নামে যেমন *মনুস্মৃতি* সঙ্কলন করা হয়েছিল। অথবা *ভগবদ্‌গীতায়* চাতুর্বর্ণ্যের সমর্থন তথা নারী ও শূদ্রের হীনস্থানের তত্ত্ব শ্রীভগবানের নামে প্রচার করা হয়েছিল। এও অসম্ভব নয় যে চার্বাক নিজেই বৃহস্পতি ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

চার্বাকবাদকে কেন লোকায়তবাদ বলা হয় তারও কিছু ব্যাখ্যা আছে। গুণরত্ন বলেছেন যে, এই মতবাদীরা নির্বিচারে সাধারণ লোকের মত আচরণ করে থাকে, তাই এদের নাম লোকায়ত বা লৌকায়তিক। মাধবাচার্যের মতে, প্রায় সব লোকই চার্বাকের এই কথায় বিশ্বাস করে যে, যতকাল বাঁচবে সুখেই

বাঁচবে, কারণ মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই, দেহ একবার ভস্মীভূত হলে আর ফিরে আসে না। অতএব চার্বাক মতের আরেক নাম হয়েছে লোকায়ত। সে যাই হোক, আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই দেখানো যে বৃহস্পতি-চার্বাক-লোকায়তবাদ একই সমাজ দর্শনের বিভিন্ন নাম, আর প্রাচীন ভারতে এই সমাজ দর্শনের প্রধান প্রচারক ছিলেন চার্বাক।

চার্বাকবাদের মূল দার্শনিক বক্তব্য ছিল দেহের সঙ্গে চৈতন্য এবং আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে। আর এই মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তার সমাজদর্শন। মূল চার্বাকদর্শনের অসূয়াশূন্য ভাষ্য যাদের রচনায় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য এবং জয়ন্ত ভট্টই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ "যে লোকায়তরা শুধুমাত্র দেহের মধ্যে আত্মদর্শন করে, তারা মনে করে যে দেহের অতিরিক্ত কোনও আত্মা নেই। তারা বলে যে পৃথিবীর কোনও বাহ্যিক বস্তুর মধ্যে যদিও চৈতন্য নেই, তথাপি বিভিন্ন বস্তু উপাদানের বিশেষ সংযোগে শরীর সৃষ্টি হলে তার মধ্যে মদশক্তির মত চৈতন্যের জন্ম হয়। চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই পুরুষ। দেহের অতিরিক্ত এমন কোনও আত্মা নেই যা নাকি স্বর্গে বা নরকে যেতে পারে। যেহেতু শুধুমাত্র দেহেই চৈতন্য বর্তমান, অতএব একমাত্র দেহই চেতনাত্মা। এ কারণেই তারা উল্লিখিত শরীরভাব প্রভৃতি বক্তব্য তুলে ধরে। আমরা যদি জানি যে কোনও বস্তু যেখানে থাকে সেখানে অন্য একটি বস্তুও থাকে, আর যেখানে প্রথমোক্ত বস্তুটি থাকে না সেখানে অন্য বস্তুটিও থাকে না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুটির একটি গুণ মাত্র। যেমন অগ্নির সঙ্গে উষ্ণতা এবং আলোর সহাবস্থান দেখে আমরা উষ্ণতা এবং আলোকে অগ্নির গুণ বলে থাকি। স্বতন্ত্র আত্মার সমর্থকেরা প্রাণ, কর্মপ্রচেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি যেসবকে আত্মার গুণ বলে থাকে, তাও প্রকৃতপক্ষে শরীরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, শরীরের বাইরে নয়। যেহেতু শরীরের বাইরে এসবের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নেই, অতএব এরা শরীরের গুণ মাত্র। অতএব শরীর থেকে আলাদা কোন আত্মা নেই।"

জয়ন্ত ভট্ট প্রথমে 'শরীরাত্মবাদীচার্বাকমতম্'-এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন এই বক্তব্য দিয়ে যে, লোকায়তিকেরা পরলোকের অপবাদ দেয়, এবং বলে যে চৈতন্যখচিত কায়া ছাড়া আর কোনও আত্মা নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন বস্তুর সমাহারে মদ্যের মাদকশক্তি সৃষ্টির সঙ্গে শরীরের মধ্যে চৈতন্যের আবির্ভাবের চার্বাকমতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরে এই মতাবলম্বী চার্বাকবাদীদের 'ধূর্ত চার্বাক' আখ্যা দিয়ে 'সুশিক্ষিত' চার্বাকদের মত ব্যাখ্যা

করেছেন। এই সুশিক্ষিত চার্বাকেরা দেহের মধ্যে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা বলে যে এই আত্মা শরীরের সঙ্গেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তার পরে এর আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। নচেৎ মানুষের পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকত। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অনুমানের ব্যাপারে জয়ন্ত সপ্তম শতাব্দীর চার্বাকবাদী পুরন্দরের মতকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। পুরন্দর বলেছিলেন যে, অনুমান কখনও কখনও প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে, যদি তা অলৌকিকত্বকে পরিহার করে লৌকিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অনেকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক অনুমান সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এই অনুমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করতে পারবে না।" জয়ন্ত পুরন্দরের নাম উল্লেখ না করে তাঁর মতকে সমর্থন করতে গিয়ে এই উদাহরণ দিয়েছেন যে, নারিকেল দ্বীপের অধিবাসীরা আগুন জ্বালাতে জানে না বলে তাদের পক্ষে ধূম থেকে অগ্নির অনুমান করা সম্ভব নয়।"

দেহ, আত্মা, চৈতন্য এবং প্রমাণ সংক্রান্ত চার্বাকবাদী দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে যে সমাজদর্শন গড়ে উঠেছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় হরিভদ্র সুরির *ষড়দর্শনসমুচ্চয়* গ্রন্থে। মাত্র সাতটি শ্লোকে চার্বাকবাদী সমাজদর্শন সম্বন্ধে হরিভদ্র বলেছেন ঃ "লোকায়তবাদীরা বলে যে দেবতা এবং মোক্ষ নেই। ধর্মাধর্ম এবং পাপপুণ্যের ফলও নেই। সমস্ত বিশ্বজগৎ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর। চালাক প্রেমিক যেমন নেকড়ে বাঘের পা দেখতে উৎসুক প্রেমিকাকে ধুলোয় আগে থেকে ফেলে রাখা নিজের আঙুলের ছাপ দেখিয়ে বলে, ভদ্রে, এই দ্যাখো নেকড়ে বাঘের পা, তেমনি ধূর্তজনেরা সাধারণ মানুষকে ছলনা দ্বারা ধর্মাধর্ম বুঝিয়ে ভুলিয়ে রাখে। হে সুনয়না (গুণরত্নের উদ্ধৃতিতে আছে 'চারুলোচনে', কিন্তু একই গ্রন্থের মণিভদ্র সুরির আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর টীকার উদ্ধৃতিতে আছে 'জাতশোভনে), পান কর আর খাও। যা একবার অতীত হয়েছে, তা আর ফিরে আসবে না। হে ভীরু, এই শরীর একবার গেলে আর কখনও ফিরে আসে না। মাটি, জল, তেজ ও বায়ু, এই চার বস্তু-উপাদানের জমিতেই চৈতন্যের জন্ম হয়েছে, এবং একমাত্র এরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে (গুণরত্নের টীকা অনুযায়ী চার্বাকবাদীদের একাংশ ব্যোম বা মহাশূন্যকে পঞ্চম উপাদান বলে স্বীকার করত)। মাটি প্রভৃতি বস্তু উপাদানের সমাহারেই দেহাদির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ সমাহারে মদ্যে মাদকশক্তি সৃষ্টি হয়, তেমনি বিভিন্ন জড়বস্তুর বিশেষ সমাহারে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। অতএব দৃষ্ট বস্তুকে

পরিত্যাগ করে অদৃষ্ট বিষয়ের প্রবর্তনা মানুষের মূঢ়ত্বের পরিচায়ক মাত্র। তপস্যা দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর লাভ এবং অনভীষ্ট বস্তুর অলাভ (গুণরত্ন ও মণিভদ্রের টীকা অনুযায়ী পাপপুণ্যের ফলে স্বর্গলাভ এবং নরক থেকে নিষ্কৃতি) থেকে মানুষের প্রীতিলাভ আকাশের মতোই শূন্য।" এ ছাড়া চার্বাকবাদী সমাজ দর্শনের একটি মূল বক্তব্য জয়ন্ত ভট্ট, গুণরত্ন এবং মাধবাচার্য সহ অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।' — যতদিন জীবন আছে সুখে বাঁচাই বিধেয়, কারণ মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই। দেহ একবার ভস্মীভূত হলে তা আবার ফিরে আসবে কোথা থেকে?

মাধবাচার্য-কৃত *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-এর প্রথম পরিচ্ছেদে চার্বাকবাদী সমাজদর্শনের বাইশটি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি উপরের আলোচিত চার্বাকদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। উপরের উদ্ধৃত শ্লোকটি ছাড়াও (এটির একটি বিকল্প শ্লোকে আবার 'নাস্তিমৃত্যোরগোচরঃ'-এর পরিবর্তে 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' আছে — এটি সন্দেহজনক) আছে ঃ 'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। /নৈব বর্ণাশ্রমাদিনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥ /অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদন্ডং ভস্মগুন্ঠনম্।/বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥/ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতাস্ত্বিহ।/ ভূতানাং প্রেতকার্যানি ন ত্বন্যবিদ্যতে ক্বচিৎ॥/ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভন্ডধুর্তনিশাচরাঃ।/ জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পন্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥' — স্বর্গ-নরক নেই, পারলৌকিক আত্মাও নেই। বর্ণাশ্রমাদির ক্রিয়াও নিষ্ফলা। অগ্নিহোত্র (যজ্ঞ), তিন বেদ, ত্রিদন্ড এবং ভস্মলেপন বুদ্ধিও পৌরুষহীন মানুষদের জীবিকার উপায় মাত্র। মৃত লোকদের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের জীবিকার উপায় হিসেবে তাঁদের দ্বারা রচিত বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। তিন বেদের রচয়িতারা ধুর্ত, ভন্ড এবং নিশাচর। পন্ডিতদের দ্বারা উচ্চারিত জর্ফরী-তুর্ফরী ইত্যাদি মন্ত্র (অশ্বেমেধ যজ্ঞে ঋগ্বেদীয় মন্ত্রবিশেষ) অর্থহীন হাজর-বাজর মাত্র।

কিন্তু মাধবাচার্য দ্বারা উদ্ধৃত অন্য বেশ কয়েকটি শ্লোক প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ মতেরই পরিচায়ক, চার্বাক মতের নয়। এদের মধ্যে আছে যজ্ঞে পশুবলির বিরোধিতা, মাংস খাবার বিরোধিতা ইত্যাদি। এখানে প্রশ্ন ওঠে, অষ্টম শতাব্দীতে হরিভদ্র সুরি দ্বারা উদ্ধৃত মাত্র সাতটি শ্লোকের বাইরে এতগুলি অতিরিক্ত শ্লোক মাধবাচার্য চর্তুদশ শতাব্দীতে পেলেন কোথায়, আর এর মধ্যে বৌদ্ধ মতের অনুপ্রবেশই বা ঘটলো কি করে? আমাদের নিজস্ব গবেষণার সিদ্ধান্ত এই যে

অতিরিক্ত শ্লোকগুলি এসেছে *বিষ্ণুপুরাণ* এবং দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণ মিশ্রের *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটক থেকে। এই দুটি গ্রন্থে একই সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাকবাদীদের আক্রমণ করতে গিয়ে তাদের যুক্তিগুলিকে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ*-এর কল্পকাহিনী অনুযায়ী দেবতাদের অনুরোধে অসুরদের (বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাকপন্থী সহ সমস্ত বেদ এবং চাতুর্বর্ণ্যবিরোধী) বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু মায়ামোহকে পৃথিবীতে পাঠালেন তাদের কুশিক্ষা দিতে। মায়ামোহ অসুরদের যেসব উপদেশ দিলেন তা মাধবাচার্যের অনেক শ্লোকের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আবার *প্রবোধচন্দ্রোদয়*-এ চার্বাক চরিত্রের উক্তিগুলির সঙ্গেও মাধবাচার্যের আরও কতকগুলি শ্লোক হুবহু মিলে যায়। *ষড়দর্শনসমুচ্চয়, বিষ্ণুপুরাণ* এবং *প্রবোধচন্দ্রোদয়*-এর সবগুলো শ্লোক এক সঙ্গে করলে তাদের মধ্যে *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে উদ্ধৃত সবগুলো তথাকথিত চার্বাকবাদী শ্লোকই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এগুলো সব চার্বাক মতের প্রতিফলন নয়, চার্বাক ও বৌদ্ধ মতের মিশ্রণ।

হরিভদ্র এবং মাধবাচার্য এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, চার্বাকবাদীরা কামাসক্ত ছিল। কিন্তু কৌটিল্যোক্ত বৃহস্পতি বাদে, শঙ্করাচার্যের *বেদান্তসূত্র*-তে, অথবা জয়ন্ত ভট্টের *ন্যায়মঞ্জরীতে* এরকম কোনও কথা নেই। অতএব এ জাতীয় উক্তি ধর্মবিশ্বাসী গ্রন্থকার ও টীকাকারদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আবিষ্কার বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিশ্বজগৎ কাম থেকে উৎপন্ন, এই তত্ত্ব ঋগ্বেদেই আছে। সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীভগবান চরিত্রও বলেছেন যে, মহদ্‌ব্রহ্ম বা বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর যোনি, তিনি তাতে গর্ভাধান করেছেন। এভাবেই সমস্ত জীব সৃষ্ট হয়েছে এবং তিনিই তাদের বীজপ্রদ পিতা। আরও মনে রাখা দরকার যে ধর্মশাস্ত্র রচয়িতারাও অর্থশাস্ত্র (অর্থনীতি ও রাজনীতি) এবং কামশাস্ত্রকে অস্বীকার করতেন না। চার্বাকবাদীরা ধর্ম আর মোক্ষকে বাদ দিয়েছেন বলেই তাদের বিরুদ্ধে অনেক ধর্মবিশ্বাসী গ্রন্থকারের বিদ্বেষ ছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে *ষড়দর্শনসমুচ্চয়*-এর গুণরত্নকৃত টীকা অনুযায়ী কাপালিক, যোগিনী, ব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ জাতিরা লোকায়তবাদী হয়। তারা বছরে একবার উন্মুক্ত স্থানে জাতিবর্ণনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই বক্তব্য থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তান্ত্রিকদের নামই ছিল লোকায়তবাদী। কিন্তু যে কুন্ডলিনী শক্তির মূলাধার থেকে সহস্রারে উত্থান তন্ত্রের মূল কথা, তার কোনও চিহ্ন

চার্বাকবাদে ছিল না। তা ছাড়া সব শ্রেণীর তান্ত্রিকই কাপালিক বা যোগিনী ছিল না, কিংবা গুণরত্ন বর্ণিত ক্রিয়াকলাপে অংশ নিত না। রাষ্ট্রশক্তি ও শাসকশ্রেণীর আক্রমণে চার্বাকবাদ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে অনেক চার্বাকবাদী সহজিয়া, তান্ত্রিক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে। এটাই সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীতে গুণরত্নের বিভ্রান্তির কারণ।

যে আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে চার্বাকবাদকে প্রাচীন এবং মধ্যযুগে ধ্বংস করা হয়েছিল তা এদেশে আজও প্রাসঙ্গিক। বৈদিকোত্তর ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল চাতুর্বর্ণ্যভিত্তিক অসম আর্থসামাজিক কাঠামোর ধারক ও বাহক। বেদ, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং পরে *ভগবদ্গীতা* ও পুরাণের সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় এই আর্থসামাজিক কাঠামোকে বলবৎ রাখত। এ রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে নাস্তিক, বেদবিরোধী, যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ এবং শ্রাদ্ধাদি সহ সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বিরোধী, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের শত্রু, আর বিশেষত চাতুর্বর্ণ্য প্রথা বিরোধী চার্বাকবাদের প্রবক্তা এবং তাদের গ্রন্থগুলিকে রাষ্ট্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণীর যৌথ তৎপরতায় ধ্বংস করে ফেলা হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এই বিদ্বেষ বশতই মনু চার্বাকবাদীদের 'পাষন্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে চাতুর্বর্ণ্য বিরোধী সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করে চাতুর্বর্ণ্যভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে সুঙ্গযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাতশ' বছর ধরে সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ করা হয়। সম্ভবত এ কারণেই চার্বাকবাদের মূল গ্রন্থগুলি ধ্বংস-লুপ্ত হয়ে যায়, আর এই সমাজদর্শনও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে আবার চাতুর্বর্ণ্য বিরোধী সব শক্তিকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। এর ফলে দশম-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং চার্বাকবাদ সহ সমস্ত চাতুর্বর্ণ্য বিরোধী শক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাহিত্যিক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। বেদান্তরক্ষক বিষ্ণুভক্ত রাজার পক্ষে এবং বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক ও চার্বাকবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, পতঞ্জলি যোগ এবং মীমাংসা শাস্ত্র উপস্থিত হল। ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এরা অন্য দিক থেকে পরস্পরবিরোধী হলেও সকলেই বেদের সমর্থক বলে বেদবিরোধী নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নামলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি পাষন্ড শাস্ত্রগুলির অগ্রবর্তী ছিল। তাদের পরস্পরের

সংঘাতেই বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি ধ্বংস হল। এভাবে মূল নষ্ট হবার ফলে অন্যান্য পাষন্ড শাস্ত্রগুলি বেদান্তের শাস্ত্রসাগরে ভেসে গেল।

এভাবে রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় চার্বাকবাদের উপরে বেদ ও চাতুর্বর্ণ্যের সমর্থকদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রধান কারণ এই ছিল যে, চার্বাকবাদ শ্রুতি, স্মৃতি ও চাতুর্বর্ণ্যভিত্তিক গভীর আর্থিক ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি বহন করত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকে চার্বাকের আরেক নাম কলি। আর মহাভারতের বনপর্বে মার্কন্ডেয় ঋষি বলেছেন যে, কলিযুগে চাতুর্বর্ণ্য প্রথা উঠে গিয়ে সব মানুষ একবর্ণ হবে। উচ্চ নীচ হবে আর নীচ উচ্চ হবে। যে শূদ্রকে বশে রাখবার উদ্দেশ্যে তার ধনসঞ্চয় ধর্মশাস্ত্রে এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সে শূদ্র প্রভুকে অমান্য করে ধনসঞ্চয় করবে, উদ্ধত আচরণ করবে, আর ব্রাহ্মণকে জ্ঞান দান করতে চাইবে। ব্রাহ্মণেরা 'হা মাতা, হা পিতা' বলে আর্তনাদ করতে করতে অশরণ হয়ে চারিদিকে পালিয়ে বেড়াবে। এ অবস্থার প্রতিকার করতেই শেষ পর্যন্ত 'কল্কি অবতার' আবির্ভূত হয়ে সব শূদ্র ও ম্লেচ্ছদের নিধন করে এবং পৃথিবীর শাসনভার ব্রাহ্মণদের হাতে অর্পণ করে স্বর্গে ফিরে যাবেন। চার্বাকবাদ ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ এবং একবর্ণ বা জাতিবর্ণহীন কলিযুগের বার্তাবহ। আর জাতিবর্ণভেদের গভীর অসাম্য ও নিষ্ঠুর অমানবিকতায় কলুষিত-জর্জরিত আধুনিক ভারতীয় সমাজের কাছে এখানেই বর্তমান চার্বাকবাদের একটি মৌলিক প্রাসঙ্গিকতা।

আধুনিক ভারতের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের আরেকটি সর্বগ্রাসী কলুষ ধর্মপ্রসূত সাম্প্রদায়িকতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই ধর্মীয় রাজনীতির উর্বর জমিতে এই বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠতে শুরু করে এবং তার পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারত বিভাগের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের ধন-মান-জীবন কেড়ে নিয়ে ডেকে আনে অবর্ণনীয় বিভীষিকা। সে ধর্মান্ধতা, আর থেকে থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির আসুরিক অভিযান আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনীতি মানব সভ্যতাকে টেনে নিয়ে চলেছে গভীর অন্ধকারের দিকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে যে ভাববাদী সহনশীলতা বা প্রেমের তত্ত্বে, অথবা রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বে, এ নরক থেকে উদ্ধার পাবার আশা ক্ষীণ। এখানেই চার্বাকবাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা। ধর্মশাস্ত্র, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিতকুল সহ সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে বর্জন করে চার্বাকবাদ যে বিজ্ঞান

মনস্কতা, যুক্তি ও মানবতার বীজ বপন করেছে, তার মাঝেই সুপ্ত আছে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী রাজনীতি থেকে পরিত্রাণের উপায়। ধর্মশাস্ত্রবিরোধী, বর্ণভেদবিরোধী চার্বাকবাদীদের কাছে পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতি আছে — স্ত্রী জাতি এবং পুরুষ জাতি। এর বাইরে মানবসমাজে আর কোনও জাতি নেই। এই তত্ত্বই মানবধর্ম ও মুক্তিপথের দিশারি।

আমরা অন্যত্র বিস্তারিত তথ্য ও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি যে অন্যান্য অনেক দেশের মতো এ দেশেও বৈদিকোত্তর যুগ থেকেই ধর্ম নারীকে শৃঙ্খলিত ও পদানত করে আর্থসামাজিক কাঠামোর পাদদেশে নির্বাসিত করেছে, আর তাকে রেখেছে একাধারে পুরুষের ভোগ্যবস্তু ও দাসী করে। এই হীনস্থান থেকে নারীর মুক্তির উপায়ও চার্বাকবাদের মধ্যে নিহিত আছে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন তুলে দিয়ে চার্বাকবাদ নারীর হীনস্থানের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ভিতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। শ্রীহর্ষ রচিত *নৈষধচরিতম্* কাব্যে নারীমুক্তি সম্বন্ধে চার্বাকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যে উল্লেখ আছে, তা থেকেও এ বিষয়ে চার্বাকবাদের প্রগতিশীল ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্যের এক জায়গায় বৃহস্পতি ব্রাহ্মণদের বলছেন ঃ "কামাসক্তির দিক থেকে নারী-পুরুষে পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও যারা ঈর্ষাবশত নারীদের ঘরে বন্ধ করে রাখে, অথচ পুরুষদের বন্ধ করে রাখে না, সে দাম্ভিক কুলমর্যাদাবাদীদের ধিক্। ... নারীদের সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক কথাবার্তা (ঘৃণাবাদান্) তৃণের মতো ত্যাগ করো। তুমিও তো তাদের মতোই, তবে কেন চিরকাল মানুষকে বঞ্চনা করছ (তথাপি তাদৃশৈব কা চিরং জনবঞ্চনা)?" যে দেশে নারী চিরকাল সারা পরিবারের দাসীবৃত্তি করেছে, আর পরিবারের পুরুষদের পেট ভরিয়ে নিজে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থেকেছে, সে দেশে চার্বাকবাদ অসীম সাহসিকতায় নারীকে সাম্য ও সম্মানের আসনে বসিয়ে নিঃসংকোচে বলেছে ঃ পিব খাদ চ চারুলোচনে! যদতীতং বরগাত্রি! তন্ন তে। ন হি ভীরু! গতং নিবর্ততে সমুদয়মাত্রমিদং কলেবরম্।"

নারীমুক্তির জন্য সমস্ত আর্থসামাজিক কাঠামোকেই ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশেষত, শিক্ষা ও স্বাধীন জীবিকার মাধ্যমে পরিবারে নারীর অবস্থানের উন্নতিবিধান অপরিহার্য। প্রচলিত পরিবার প্রথার অভ্যন্তরে পূর্ণ নারীমুক্তি আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু চার্বাকবাদ যে অন্তত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুশাসনের কারাগার ভেঙে নারীমুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু আধুনিক ভারতের পক্ষে চার্বাকবাদের সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবত

মানব জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বস্তু ছাড়া চৈতন্য নেই, দেহ ছাড়া আত্মা নেই, স্বর্গ-নরক-পরলোক নেই, এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও সৃষ্টিবিজ্ঞান এই সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে যে, মহাবিশ্বে বস্তুর বিবর্তন, বিস্ফোরণ এবং বস্তুকণার বিশেষ সমাহার থেকেই কালে চৈতন্যের জন্ম হয়েছে। বস্তুহীন কোনও চৈতন্য কিংবা আত্মা মহাবিশ্বে কোথাও নেই। দেহের অভ্যন্তরেও মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া কোন বিদেহী আত্মা নেই। নেই হৃৎপিন্ডের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ রূপে কিংবা অন্য কোনও রূপে দেহের অন্য কোথাও। আত্মা সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য বলেই বিজ্ঞান তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারেনি, এ ভাবনাও অমূলক। কারণ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য অনেক বস্তুকণা বা তরঙ্গ আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু মহাকাশে কিংবা প্রাণীদেহে বিদেহী আত্মা অথবা চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এদিক থেকে বিচার করলে সমকালের পটভূমিতে চার্বাকবাদের বক্তব্য ছিল অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিকতায় সমৃদ্ধ।

মানব জীবনের প্রতি এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই গড়ে উঠেছিল চার্বাকবাদের জগন্মুখী সমাজদর্শন, যা দূর করতে পারে এই মায়া-মোক্ষ-অদৃষ্টবাদী দেশের অবিদ্যার অন্ধকার। আত্মার পরলোকে সদ্‌গতি নয়, পৃথিবীর জীবনকে সুখী ও সুন্দর করে তোলাই ছিল চার্বাকবাদের মূলমন্ত্র। অন্তহীন ভোগবাদ মানব জীবনের সৃষ্টিশীলতা এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে প্রতিহত করে মানুষকে ক্রমশ শুধুমাত্র বস্তুনির্ভর করে তোলে। কিন্তু ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষা এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবও অনিবার্যভাবেই স্তব্ধ করে দেয় মানব জীবনের বিকাশের সম্ভাবনা। পার্থিব জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে এই জাগতিক সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই চার্বাকবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বলগাহীন ভোগবাদের উপরে নয়। কারণ তারা জীবনকে আনন্দময় স্বাচ্ছন্দগতি করবার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে সৌন্দর্যের উপাসকও ছিলেন। নৃত্যগীত সহ সমস্ত ললিতকলাকে তারা গ্রহণ করেছিলেন মানব জীবনের আবশ্যিক উপকরণ হিসেবেই।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে চার্বাকবাদীরা সত্যিই ঋণ করে ঘি খাবার ভোগবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তবে প্রাচীন বা আধুনিক ভারতের ব্যবহারিক মূল্যবোধে তাই বা এমন কি দুষণীয়? বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতা বাস্তবে ভোগবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরও ধন, আরও গাভী, আরও সন্তান, আরও ঐশ্বর্য, শত্রু নিধন প্রভৃতি অগণিত জাগতিক লাভের প্রার্থনা অনিবার

উঠেছে আকাশে। চণ্ডীপূজা-শক্তিপূজার (যার মধ্যে দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-সরস্বতী—সবাই আছেন) মূল প্রার্থনা যে 'দেহি দেহি', তার সবই জাগতিক ভোগৈশ্বর্য বিষয়ক। আর আধুনিক কালে ভারতবর্ষ সহ সারা দুনিয়ার মধ্যবিত্তই তো বাড়ি-গাড়ি-টিভি-ফ্রিজ সহ বহু ভোগ্যদ্রব্য ঋণের মাধ্যমে কিনে নিজ আয়ের উপরে উঠে ভোগেসুখে জীবনযাপনের নীতি ও রীতি গ্রহণ করেছে। ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ এ পথে জাগতিক সুখের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দিকেও এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে মায়াবাদ ও দুঃখবাদ, অদৃষ্টবাদ এবং মোক্ষের আদর্শের চেয়ে চার্বাকবাদী পুরুষকার এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শই অনেক বেশি বিজ্ঞান এবং মানবতাসম্মত। এদেশের অধিকাংশ মানুষই ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। অতএব এখানে মায়াবাদ-মোক্ষবাদ-অদৃষ্টবাদের চেয়ে চার্বাকবাদের প্রয়োজন অনেক বেশি।

আধুনিক দার্শনিক পি.টি. রাজু চার্বাকবাদের মানবতা এবং ললিতকলার প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করেও এই অভিযোগ এনেছেন যে, রাষ্ট্রশক্তির উপর থেকে ঈশ্বর ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে এই সমাজদর্শন কার্যত রাজনৈতিক স্বৈরাচারের সমর্থন করেছে। কারণ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নাকি তাদের কোনও বক্তব্য ছিল না। তারা ধর্মশাস্ত্রের ধর্মীয়-সামাজিক বিধানগুলি অমান্য করলেও রাজকীয় বিধান বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবারই পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু এই সমালোচনা অমূলক মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। চার্বাকবাদের মূল গ্রন্থগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে পরোক্ষ সূত্র থেকে যেটুকু পাওয়া গেছে তার মধ্যে অবশ্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি কোনও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত ঘটনা এই যে, যাকে বর্তমানে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তি-অধিকারের তত্ত্ব বলা হয়, প্রাচীনকালে একমাত্র গ্রিক সভ্যতায়ই তার অস্তিত্ব ছিল, যদিও তা ছিল শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, *মনুস্মৃতি* এবং *শুক্রনীতিসার* সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনও প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে, অথবা ছয় দর্শনের একটিতেও এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য নেই। এই সব গ্রন্থ এবং দর্শনই (বৌদ্ধ ধর্ম সম্ভবত কিছুটা ব্যতিক্রম) বেদ-ব্রাহ্মণের নিয়ন্ত্রণ বাদে জাগতিক ব্যাপারে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল। এই পটভূমিতে যে চার্বাকবাদীরা রাষ্ট্র সমর্থিত ধর্ম এবং চাতুর্বর্ণ্যের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন, তারা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের সমর্থক, এ কথা যুক্তিসম্মত বলে মেনে নেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে যদি কোনও বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তা থেকে থাকে, তবে তা একমাত্র চার্বাকবাদীদের মধ্যেই ছিল।

চার্বাকবাদের অভ্যন্তরে যে ব্যাপক আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক বিপ্লবের বীজ সুপ্ত ছিল, তা উপলব্ধি করেছিলেন 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার মণিভদ্র সুরি। চার্বাকবাদীদের দৃষ্টিতে তাদের সমাজদর্শনের বৃহত্তর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, "যা বাস্তব আর যা অবাস্তব, তা প্রমাণের জন্য যদি একমাত্র প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করা হয়, তবে জগৎ ব্যবস্থার বাস্তবতাকে আর অস্বীকার করা সম্ভব হবে না।" তখন "দরিদ্রো হি স্বর্ণরাশির্মেহস্তীত্যনুধ্যায় হেলয়ৈব দৌস্থ্যং দলয়েৎ"—দরিদ্র মানুষ 'স্বর্ণরাশি আমার' এই ধারণা করে নিজ দুস্থতাকে হেলায় দলন করবে। "দাসোহপি স্বচেতসি স্বামিতামবলম্ব্য কিংকরতাং নিরাকুর্যাৎ" — দাসও নিজের মনে প্রভুত্ব ভাব অবলম্বন করে নিজ দাসত্বকে ধ্বংস করবে। কোনও লোকই আর নিজের অনভিপ্রেত জীবিকা মেনে নেবে না। "এবং ন কশ্চিৎ সেব্যসেবকোভাবো দরিদ্রধনীভাবো বা স্যাৎ'— এ ভাবে সেব্য-সেবক এবং ধনী-দরিদ্র পার্থক্য মুছে যাবে। "তথা জগদ্ব্যবস্থাবিলোপপ্রসঙ্গ ইতি"—আর জগৎ ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বিলোপের প্রসঙ্গ উঠবে। মণিভদ্র চার্বাকবাদের বক্তব্য আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এই সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কা থেকেই অনুমানের দ্বারা প্রমাণের পক্ষপাতি ধর্মের ছদ্মবেশধারী পরবঞ্চনাপ্রবণ ধূর্তেরা (ধর্মচ্ছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণাঃ) মানুষকে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি থেকে লভ্য ভোগাভোগের লোভ দেখিয়ে তাদের মধ্যে মুগ্ধ ধর্মান্ধতা উৎপাদন করে (মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যং চোৎপাদয়ন্তি)। যেমন চতুর প্রেমিক আগে থেকে ধুলোর উপর নিজ আঙ্গুলের ছাপ ফেলে রেখে পরে বৃকপদ দেখতে উৎসুক অজ্ঞ প্রেমিকাকে সে ছাপ দেখিয়ে বলে ভদ্রে, বৃকপদ দেখো। এতবড় সামগ্রিক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি প্রাচীন ভারতের, এমন কি প্রাচীন পৃথিবীর আর কোনও সমাজদর্শনে ছিল কি?

স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী আধুনিক মানব সভ্যতার সর্বজনীন আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শের লক্ষ্যে কোনও বিশেষ দেশের বৌদ্ধিক নবজাগরণ এবং আর্থসামাজিক রূপান্তরের তাত্ত্বিক উপকরণ সম্ভাব্য স্থলে সে দেশের ঐতিহ্য থেকেই আসা বাঞ্ছনীয়। নতুবা সে জাগরণ বা আদর্শের শেকড়ের জোর থাকে না। ভারতবর্ষের মতো নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরার দেশ সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। চার্বাকবাদ এমনই একটি স্বাধীন বলিষ্ঠ আদর্শ যা প্রাচীন ভারতের আর্থসামাজিক অসাম্য এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর সাহস ও শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে আদর্শ ছিল বিজ্ঞানসম্মত এবং

মানবতাভিত্তিক, আর সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীর পরিপূরক। কিন্তু চার্বাকবাদের একটি মৌলিক দুর্বলতা এই ছিল যে তার মধ্যে কোনও সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ অথবা রাজনৈতিক প্রতিরোধ বর্তমান ছিল না। এ মতবাদ ছিল সম্পূর্ণই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগসুখের উপর অধিষ্ঠিত। সে কারণে চার্বাকবাদীদের কোনও গণসংগঠনও গড়ে ওঠেনি। ফলে রাজতন্ত্র এবং চাতুর্বর্ণ্যে গঠিত সমাজে রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠবলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণী সহজেই তাদের পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল। আধুনিক যুগের বাস্তবতার পটভূমিতে চার্বাকদর্শনের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিলেই তা আধুনিক ভারতবর্ষের প্রগতির পথে তাত্ত্বিক আদর্শের রূপ নিতে পারে। ধনী-দরিদ্র, প্রভু-দাস, আর্য-শূদ্র, পুরুষ-নারী, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের মুলদেশে আঘাত করতে পারে বিপুল শক্তিতে। আর মায়া-মোক্ষ-অদৃষ্টের হাত থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করে জাগিয়ে তুলতে পারে তার সুপ্ত শক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টাকে। চার্বাকবাদ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী। কিন্তু এমন অধর্মের অল্পও পারে আধুনিক ভারতকে মহাভয় থেকে ত্রাণ করতে। স্বল্পমপ্যস্য অধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

৯

শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার ধর্ম

অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও প্রাচীন কাল থেকেই শাসকশ্রেণী ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তাদের শোষণশাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার রূপে। সেকালে রাষ্ট্রের হাতে আধুনিক সমরোপকরণ থাকা সম্ভব ছিল না। রাজা এবং সামন্তশ্রেণীর সৈন্যদের হাতে যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র থাকতো, শাসিতশোষিত জনসাধারণের কাছেও সেসব অস্ত্রশস্ত্র ছিল সহজলভ্য। অবশ্য শাসকশ্রেণী অনেক সময় জনসাধারণের পক্ষে অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ করে দিতো। যেমন এদেশে আর্য শাসকশ্রেণীই ছিল জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ। এভাবে কার্যত মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর বাইরে সমস্ত জনগণকেই নিরস্ত্র করে রাখার চেষ্টা হতো। জনগণের সম্ভাব্য বিদ্রোহের আশংকায়। কিন্তু শাসকশ্রেণী ভালোই জানতো যে এভাবে জনগণকে দীর্ঘকাল দমন করে রাখা যাবে না। কার্যত যেতোও না। অতএব তারা শস্ত্রশক্তির পরিপূরক হিসেবে প্রয়োগ করতো ধর্মশক্তি। শক্তিশেলের সংগে ভক্তিশেল। রাষ্ট্রশক্তির এই দ্বিমুখী অভিযানের মাধ্যমে সহজ হতো নিপীড়িত প্রজাসাধারণকে মন্ত্রশান্ত ভুজংগ বানিয়ে রাখতে।

প্রাচীন কাল থেকেই শাসকশ্রেণীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে প্রতিকূল প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শক্তির সামনে জনগণের অনিরাপত্তাবোধ থেকে তাদের এক বড় অংশের মনে কাল্পনিক অলৌকিক সত্তার প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। শৈশবের বিপুল অনিরাপত্তার মধ্যে মাতাপিতার কাছে মানুষ যে সুরক্ষা পেয়ে থাকে, সে স্মৃতি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সত্তার গহনে জেগে থাকে। বৃদ্ধ অথবা প্রয়াত মাতাপিতার কাছে সে সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় না বলে মানুষ তখন ভ্রান্ত চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নিজেকে অসহায় জ্ঞান করে কাল্পনিক বিশ্বপিতা

কিংবা বিশ্বমাতার ছায়ায় আশ্রয় খোঁজে। আর সুকৌশলী শাসকশ্রেণী যুগপৎ শক্তিশেল ও ভক্তিশেল প্রয়োগ করে জনগণের এই ভ্রান্ত চেতনাকে চিরন্তন রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। জনগণ আত্মশক্তি বিস্মৃত হয়। প্রকৃত শ্রেণীশত্রুর সন্ধান হারিয়ে নিয়তি, অদৃষ্ট ও কাল্পনিক অলৌকিক শক্তিকেই তাদের জাগতিক দুর্দশার উৎস জ্ঞান করতে থাকে। আর ধূর্ত শাসকশ্রেণী সেই সুযোগে নিজেদের অন্যায়-অবিচার, শোষণশাসনকে চিরায়ত করে তোলে।

প্রাচীন ভারতে কোনও রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব নির্মিত হবার অনেক আগেই প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিঃপূঃ) প্রাচীন গ্রিসের শাসকশ্রেণীকে জেনেশুনেই একটি মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব নির্মাণ ও প্রচারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণী দ্বারা জনগণকে বশে রাখবার উদ্দেশ্যে। সেটি এই যে ঈশ্বর আদিতে পৃথিবীর গর্ভে মানুষ উৎপাদন করেছিলেন। আর সে সময়ে তিনি কিছু মানুষের মধ্যে সোনা, কিছু মানুষের মধ্যে রূপো, আর বাকি সব মানুষের মধ্যে তামা আর লোহা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব মনুষ্যসমাজে শ্রেণীভেদ ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, এবং তা অনিবার্য ভাবেই জন্মলব্ধ। এভাবেই ক্রীতদাস প্রথাসহ শ্রেণীবিভক্ত প্রাচীন গ্রিক সমাজে শাসকশ্রেণীর প্রভুত্ব চিরায়ত করা সম্ভব হবে। প্লেটো বলেছিলেন যে প্রথম প্রজন্মের আমজনতা এই বানানো সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাস নাও করতে পারে। কিন্তু শাসকশ্রেণী নিরন্তর প্রচার চালিয়ে যেতে পারলে দ্বিতীয় প্রজন্ম নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

প্রাচীন গ্রিসের শাসকশ্রেণী প্লেটোর এই বানানো সৃষ্টিতত্ত্ব ভালোভাবে নির্মাণ ও প্রচার করতে পারেনি। কারণ তাদের কোনও ধর্মগ্রন্থ বা অবতারতত্ত্ব ছিল না। হোমার রচিত *ইলিয়াড* ও *ওডিসি* মহাকাব্যে, গ্রিক নাটক, অন্যান্য গ্রিক সাহিত্য, এবং সমকালীন গ্রিসের বিজ্ঞান ও দর্শন ছিল জগৎ ও জীবনমুখী। ধর্মের প্রতি উদাসীন এবং দেবদেবীদের প্রতি ব্যংগবিদ্রুপে ভরা। তাছাড়া প্রাচীন গ্রিস ছিল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর বিবদমান নগররাষ্ট্রে বিভক্ত। বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান না হলে রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব প্রচারও সম্ভব হয় না। এসব কারণে প্লেটো নির্দেশিত রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব তখন সাফল্য লাভ করেনি। আর অনেকটা সে কারণেই প্রাচীন গ্রিসের শাসকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে আমজনতাকে সম্পূর্ণ বশে রাখা সম্ভব হয়নি। গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহী পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য ভেংগে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পর পর অনেকগুলি দাস বিদ্রোহ।

নিজেদের শ্রেণীশোষণকে রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে শোষিত জনগণের

উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করে প্রাচীন গ্রিসের শাসকশ্রেণী যে মহাভুল করেছিল, প্রাচীন ভারতের শাসকশ্রেণী তা করেনি। সুংগযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে গঠিত তৎকালীন শাসক শ্রেণীর মধ্যে এক নিবিড় শ্রেণী সমঝোতা গড়ে উঠেছিল। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রশ্রেণীর জনগণের উপর তাদের শোষণশাসন কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে। এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক শ্রেণীসমঝোতার মাধ্যমেই জাতিবর্ণভেদ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব এদেশের আমজনতার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যুগপৎ রাষ্ট্রশক্তি ও শাস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যেই *মনুস্মৃতি* রচিত হয়। সুপন্ডিত ডঃ বি আর আমবেডকার গভীর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে প্রথম সুংগ সম্রাট পুষ্যমিত্র সুংগের নির্দেশক্রমে সুমতি ভার্গব নামে এক ব্রাহ্মণ *মনুস্মৃতি* সংকলন করেছিলেন। তারপর থেকে গুপ্তযুগের শেষ পর্যন্ত জাতিবর্ণ ভিত্তিক এই রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব কুপ্‌রিকল্পিত ভাবে এবং রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জনগণের উপরে প্রয়োগ করা হয়। অগণিত ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে পল্লবিত *রামায়ণ-মহাভারত*, বিশেষত *ভগবদ্‌গীতা*ও *মনুস্মৃতি* এই রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের আধার। যে ধর্মতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিবর্ণ বিভাজনের নামে নিদারুণ সামাজিক অবিচার ও শ্রেণীশোষণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেণী সমঝোতার প্রয়োজন ছিল, *মনুস্মৃতিতে* তা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেছেন ঃ "ব্রাহ্মণদের সাহায্য ছাড়া ক্ষত্রিয়েরা উন্নতি করতে পারে না। আর ক্ষত্রিয়দের সাহায্য ছাড়া ব্রাহ্মণেরাও উন্নতি করতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে ঐক্যবদ্ধ হলে উভয়েই ইহলোক তথা পরলোকে উন্নতি করতে পারে।" ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এ ধরনের শ্রেণী সমঝোতার মাধ্যমেই প্রাচীন ভারতে এক শক্তিশালী শাসকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। আর তারা রাষ্ট্রশক্তি ও শাস্ত্রশক্তির যৌথ প্রয়োগে শোষিত জনগণকে বশে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রেই রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বর্ণধর্ম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে বলবৎ রাখার। *মনুস্মৃতি, ভগবদ্‌গীতা* এবং *মহাভারতের* বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে নিম্নবর্ণের মানুষদের স্বধর্মে, অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট কায়িক শ্রমে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। এখানেই *রামায়ণে* রাম কর্তৃক শম্বুক নিধনের তাৎপর্য।

এদিকে বর্ণধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষকশ্রেণীকে সাধারণত বৈশ্যশ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হলেও ধর্মশাস্ত্রের যুগে তাদের অধিকাংশ শূদ্রে পরিণত হয়েছিল। ক্ষুদ্র চাষী এবং ভূমিহীন কৃষকেরা ক্রমশ শূদ্র হিসেবে গণ্য হতে

লাগলো। আর বড় ভূস্বামী, উদ্‌বৃত্ত ফসল এবং গবাদি পশুর ধনী ব্যবসায়ী, তথা পণ্যদ্রব্য ও মণিমুক্তোর ধনী ব্যবসায়ীরা বৈশ্য রূপে স্বীকৃতি পেল। এই অল্পসংখ্যক বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মতো আর্য খেতাব পেলো। আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কৃষক-শ্রমিক-কারিগর শ্রেণী, যারা ছিল জনসংখ্যার বিপুল গরিষ্ঠ অংশ, শূদ্র রূপে আর্থসামাজিক পিরামিডের বিস্তির্ণ তলদেশে রয়ে গেল। তাছাড়া বহিরাগত অগণিত অনার্য জনতা ও ভূমিপত্র অনার্য আদিবাসীরাও শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো। আবার কালক্রমে শূদ্রশ্রেণীর মধ্য থেকেই সৃষ্টি হলো অস্পৃশ্য অতিশূদ্র শ্রেণী। এই শূদ্রেরাই বর্তমান কালের ওবিসি, এসসি ও এসটি। এরা বর্তমানে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ।

রাজশাসনে নিম্নতম আয়ের কায়িক শ্রমে বাধ্যতামূলক ভাবে নিযুক্ত থাকা ছাড়াও শূদ্রশ্রেণী সব রকম মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের কাজ নির্দিষ্ট হয়েছিল শুধু উচ্চতর তিন আর্যবর্ণের সেবা করা। মনুর বিধানে ব্রাহ্মণ ও রাজার অধিকার ছিল যে কোন সময় শূদ্রের সম্পত্তি কেড়ে নেবার। তাছাড়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রকে প্রদেয় কর প্রভৃতি অসংখ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের চেয়ে শূদ্রদের অনেক বেশি বঞ্চিত করবার বিধান *মনুস্মৃতি* সহ সব ধর্মশাস্ত্রেই ছিল। আর সব ধর্মশাস্ত্রেই শূদ্রদের অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্র অভ্যুত্থানে সংকটাপন্ন হলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের অস্ত্রধারণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, যদিও বর্ণধর্ম অনুযায়ী তাদের পক্ষে একাজ নিষিদ্ধ ছিল। এভাবে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা শৃংখলিত এবং ধর্মশাস্ত্রের বিধানে শোষিত শূদ্রদের দ্বারা স্বেচ্ছায় এই শোষণশাসনকে ঈশ্বরের বিধান এবং পূর্বজন্মের কর্মফল হিসেবে গ্রহণ করাবার উদ্দেশ্যেই ধর্মগ্রন্থগুলিতে শূদ্রের নিরবচ্ছিন্ন কায়িক শ্রম এবং আর্থসামাজিক হীনস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। আর জন্মগত পেশাভিত্তিক বর্ণভেদই ছিল প্রাচীন শ্রেণীভেদের নামান্তর।

শাসকশ্রেণীর মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় অনুশাসনগুলিকে জনসাধারণের চেতনার গভীরে এবং ব্যবহারিক জীবনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত জনগণের পক্ষে ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে অসম সমাজব্যবস্থার পরিপূরক শাস্ত্রীয় বিধানগুলি অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। তাই গল্পচ্ছলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে পরোক্ষ ভাবে তাদের মনের গভীরে শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বিশ্বাস উৎপন্ন করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ কারণে সুংগযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত পল্লবিত রামায়ণ-মহাভারত এবং ভগবদ্‌গীতায় রাম ও কৃষ্ণের বানানো অবতারত্বকে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় রূপ দিয়ে জনমনে প্রোথিত করবার চেষ্টা

হয়েছিল। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে পল্লবিত *রামায়ণ-মহাভারত* এবং *ভগবদ্গীতা* রচনার আগে পর্যন্ত কোনও বৈদিক সাহিত্যে কিংবা *মনুস্মৃতি* সহ কোনও ধর্মশাস্ত্রে অবতারতত্ত্বের চিহ্ন ছিল না। প্রধানত গুপ্তযুগেই ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের মাধ্যমে এই তত্ত্ব উদ্ভাবিত এবং দুই মহাকাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, শ্রেণীশোষণকে চিরায়ত করবার দুরাগ্রহে।

এভাবে ধর্মশাস্ত্রে সংকলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসনগুলিকে তথাকথিত বিষ্ণুর অবতারদের মুখে আরোপ করে সেগুলিকে অলৌকিক অনুশাসন রূপে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ধূর্ত শাসকশ্রেণীর অপকৌশল। আর সেই সংগে নির্মিত এবং মহাকাব্যে প্রোথিত হয়েছিল কল্পিত যুগতত্ত্ব। যেখানে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণের, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাপর যুগে বৈশ্যের প্রাধান্যের শেষে কলিযুগে শূদ্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই বিপরীত শ্রেণী ব্যবস্থা ধর্মে অসহ্য হবার কারণে বিষ্ণুর পরবর্তী অবতার রূপে কল্কি ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। তিনি সব শূদ্র ও ম্লেচ্ছকে বিনাশ করে, আর ব্রাহ্মণদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার তুলে দিয়ে স্বর্গে ফিরে যাবেন। এভাবেই পৃথিবীতে শাসকশ্রেণীর শোষণশাসন আর শূদ্রের সর্বহারা দশা অবতারের রক্তাক্ত হস্তক্ষেপে মহাকালের বুকে চিরায়ত হবে। ধর্ম রক্ষিত হবে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে একটি কাহিনী শুনিয়ে বলেছেন যে ধর্মের সুরক্ষার জন্যই পিতামহ ব্রহ্মা রাজতন্ত্র এবং রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। সত্যযুগে সকলেই বেদ মেনে চলতো আর ধর্ম পালন করতো। তাই রাজার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু পরে মানুষেরা মোহের বশবর্তী হয়ে (মনে হয় লোকায়ত দর্শনের প্রভাবে) বেদ ও ধর্ম ত্যাগ করলো। তখন দেবতারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আগে মানুষেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশে উপর দিকে খাবার দিতো, আর আমরাও নিচের দিকে বৃষ্টি প্রভৃতি দিতাম। তারা ছিল উপর দিকে দাতা, আর আমরা ছিলাম নিচের দিকে দাতা। ফলে আমাদের অন্নচিন্তা ছিল না। কিন্তু এখন পৃথিবীর মানুষেরা বেদ এবং ধর্ম ত্যাগ করেছে। আর আমাদের অন্নাভাব দেখা দিয়েছে। আপনি আপনার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনও ভাবে এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। নতুবা আমরা সকলেই না খেতে পেয়ে মারা যাবো। ব্রহ্মা বললেন, ভেবো না, আমি এর বিহিত করছি। এই বলে তিনি এক বিশাল নীতিশাস্ত্র (প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকেই নীতিশাস্ত্র বলা হতো) রচনা করলেন। তারপর ব্রহ্মা, দেবতারা এবং ব্রাহ্মণেরা মিলে পৃথুকে পৃথিবীর রাজা রূপে অধিষ্ঠিত

করলেন (পৃথু থেকেই পৃথিবী), আর তার হাতে নীতিশাস্ত্র তুলে দিলেন। তাকে আদেশ করলেন এই নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে রাজদণ্ডের প্রভাবে পৃথিবীতে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। পৃথু তাই করলেন, আর এভাবে পৃথিবীতে ধর্ম রক্ষা পেলো। দেবতারাও বেঁচে গেলেন।

এই কাহিনী শেষ করে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে একমাত্র রাজদণ্ডের প্রভাবেই জনসমাজে ধর্ম প্রচলিত আছে। রাজার দণ্ডনীতি না থাকলে বেদ ও সমুদয় ধর্ম এক কালে বিনষ্ট হয়ে যেতো। রাজধর্মের প্রাদুর্ভাব না থাকলে কোনও মানুষই নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা রাখে না। একই ভাবে মনুও বলেছেন যে শুধুমাত্র রাজদণ্ডের ভয়েই জনগণ ধর্ম পালন করতে বাধ্য হয়, আর সে কারণেই জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন যে দণ্ড দ্বারাই ধর্ম রক্ষিত হয়ে থাকে।

প্রজাসাধারণকে ধর্মে আসক্ত রাখবার উদ্দেশ্যে রাজন্য শ্রেণীকে ধর্ম উদ্‌যাপনের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে জনসাধারণের সামনে ধর্ম পালনের উদাহরণ রাখবার উদ্দেশ্যে এবং একজন ক্ষত্রিয় হিসেবে তার যুদ্ধ করা কর্তব্য। কারণ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শ্রেষ্ঠ মানুষ যেমন আচরণ করে ইতর লোকও (ইতরোজনঃ) তেমনি করে। অতএব অর্জুন যদি যুদ্ধ না করে, তবে নিম্নবর্ণের মানুষেরাও তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে না, আর এভাবে সংসার উৎসন্ন যাবে। এভাবে অজ্ঞান জনসাধারণের 'বুদ্ধিভেদ' ঘটানো অকর্তব্য। শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে জনসাধারণকে বশে রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো সর্বদা ধর্মানুষ্ঠান করা। তিনি আরও উপদেশ দিয়েছেন যে রাজার কর্তব্য জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের বশে রাখবার এই কৌশল সযত্নে গোপন রাখা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অজস্র উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে রাজন্য শ্রেণী কিভাবে মিথ্যা ধর্মজাদুর মাধ্যমে নিজেদের ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করবে, প্রজাদের বশে রাখবে, তাদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে, আর শত্রুদেব দমন করবে। অর্থসংগ্রহে ধর্মজাদুর ব্যবহারের একটি উদাহরণ, রাজা প্রজাদের কুসংস্কার অনুযায়ী একটা কৃত্রিম দুর্লক্ষণ সৃষ্টি করে তারপর তার প্রতিকারের ছুতোয় প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ নেবে। অথবা রাজার নির্দেশে তার একজন নিজের লোক গাছের উপর লুকিয়ে থেকে বিকট শব্দ করতে থাকবে। গুপ্তচরেরা তখন চারিদিকে প্রচার করবে যে গাছে অপদেবতা ভর করেছে। তারপর সেই অপদেবতা তাড়াবার অছিলায় প্রজাদের কাছ থেকে টাকা নেবে। অথবা বাগানে একটি নকল পারিজাত ফুল রেখে দিয়ে প্রজাদের মধ্যে গুপ্তচর মারফৎ খবর

রটাবে যে রাজার মহত্ত্বের ফলে রাজ্যে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছে। অকালে রাজার বাগানে পারিজাত ফোটাই তার লক্ষণ। তখন প্রজারা সে পারিজাত দেখতে আসবে, আর সেজন্য রাজা তাদের কাছ থেকে টাকা নেবে। অথবা অনেক মাথাওলা সাপ বা সে জাতীয় অন্যান্য 'অলৌকিক' দেবদেবী বানিয়ে সেসব দেখবার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। ধর্মে অবিশ্বাসীদের ভয় দেখাবার জন্য কিছু লোককে মাদক খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রাখবে, আর সে দৃশ্য দেখিয়ে প্রজাদের বলবে যে অবিশ্বাসের ফলেই এদের এ অবস্থা হয়েছে।

জনসাধারণকে বশে রাখবার উদ্দেশ্যে রাজার গুপ্তচরেরা সর্বদা প্রচার করে বেড়াবে যে রাজা সর্বজ্ঞ এবং দেবতাদের নিত্যসহচর। মন্দিরে বা অন্য কোথাও বেদী বানিয়ে তার উপর কোনও দেবতার ফাঁপা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে চোরাপথে তার মধ্যে একজন গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেবে। তারপর রাজা পুজোয় বসবে আর মূর্তির ভেতর থেকে গুপ্তচর তার সংগে প্রশংসাসূচক কথা বলবে। রাজা তখন তার গুপ্তচরদের শিষ্যপরিবৃত সাধু, জ্যোতিষী, পুরোহিত ইত্যাদি সাজিয়ে সর্বত্র প্রচার করাবে যে এ রাজার সংগে দেবতারা সর্বদা কথোপকথন করেন। এর ফলে প্রজাদের মধ্যে কেউ আর রাজার বিরোধিতা করতে সাহসী হবে না।

প্রজাদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে রাজা তাদের একত্র করে এই মর্মে একটা বক্তৃতা করবেন যে তিনিও একজন বেতনভোগী সাধারণ মানুষ, আর দেশরক্ষার জন্য প্রজাদের সংগে নিয়ে যুদ্ধ করতে চান (প্রকৃতপক্ষে একজন ডামি রাজা সেজে যুদ্ধ করবে, আর আসল রাজা সপরিবারে পেছনে লুকিয়ে থাকবেন)। তারপর সেনাপতি যারা ভালো যুদ্ধ করবে তাদের জন্য অনেক লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করবে। তারপর রাজপুরোহিত এসে বেদ থেকে মিথ্যা উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলবে যে যারা যুদ্ধে মারা যাবে তারা ব্রাহ্মণদের চেয়েও উচ্চতর স্বর্গে যাবে। আর যারা যুদ্ধ করবে না, তারা নরকে যাবে। রাজার জ্যোতিষী, পুরোহিত এবং অন্যান্য কাছের লোকেরা রাজার অজেয় দৈব শক্তি, আর যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অমোঘ শুভ ফলের কথাও প্রচার করতে থাকবে।

যুগপৎ প্রজাদের ভয় দেখাবার আর শত্রুদের দমন করবার উদ্দেশ্যে রাজা অনেক রকম ধর্মনাটকের অনুষ্ঠান করবে। উদাহরণস্বরূপ একজন গুপ্তচরকে ন্যাড়ামাথা বা জটাধারী সাধু সাজিয়ে এবং আরও কয়েকজন গুপ্তচরকে একই রকম পোষাকে তার শিষ্য সাজিয়ে শত্রু রাজার রাজধানীর কাছে কোনও

পাহাড়ের গুহায় স্থাপিত করবে। শিষ্যরূপী গুপ্তচরেরা শত্রুরাজার প্রাসাদে গিয়ে গুরুর মাহাত্ম্য প্রচার করবে এবং তাকে দর্শনের জন্য রাজাকে আমন্ত্রণ জানাবে। রাজা এলে শিষ্যেরা তাকে বলবে যে গুরুজির বয়স চারশ বছর এবং প্রতি একশ বছর পর তিনি একবার করে নবযৌবন লাভ করেন। গুরুজি নিজেও সুদূর অতীতের বহু রাজকাহিনী এবং যুদ্ধের কথা বলে জানাবেন যে তিনি সেসবের প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর তিনি রাজাকে বলবেন যে তিনি শিগরিই অগ্নিতে প্রবেশ করে আবার নবযৌবন লাভ করবেন, আর সে সময়ে রাজা সেখানে সপরিবারে পাঁচ রাত্রি বাস করে যা বর চাইবেন তাই পাবেন। শত্রু রাজা যখন সেরকম করবে তখন শিষ্যরূপী গুপ্তচরেরা তাকে সপরিবারে হত্যা করবে। অথবা একজন গুপ্তচর দৈবশক্তি সম্পন্ন সাধু সেজে শত্রু রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করবে। কিছুকাল সেখানে অবস্থানের পর রাজার আস্থা অর্জন করে সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করবে। এমনি আরও বহু উদাহরণ দিয়ে কৌটিল্য রাজন্য শ্রেণীকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

শাসকশ্রেণী দ্বারা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করবার সে প্রাচীন ঐতিহ্য আজও সমানে চলেছে। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে হিন্দুরাষ্ট্রের জিগির তুলে যে মৌলবাদী রাজনীতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তা রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের মনুবাদী পরম্পরারই অনুসারী। হিন্দু রাষ্ট্রাদর্শ প্রতিষ্ঠার আসুরিক প্রয়াসে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস, মথুরা ও কাশীতে মসজিদ ধ্বংস করে সে জায়গায় মন্দির নির্মাণের দাবি, সামগ্রিক ইসলাম বিদ্বেষ, খ্রিস্টান নিধন প্রভৃতি কুপরিকল্পিত কার্যক্রম এই মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্ব নির্মাণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা এবং বাধ্যতামূলক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ, দেশের নানা প্রান্তে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে একাধারে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান এবং বিধর্মীদলনই মৌলবাদী ধর্মাসুরদের লক্ষ্য। আর এভাবে জনসাধারণের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে উৎসাহিত ও সঞ্জীবিত করে ধর্মীয় রাজনীতির সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি স্থায়ী ভাবে অধিকার করাই তাদের মুল উদ্দেশ্য। মৌলবাদী ধর্মাসুরদের সামনের সারিতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল এবং দুয়েকজন আপাত নরমপন্থী নেতা থাকলেও এদের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে কতগুলি ব্যাপকতর ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে, যারা তাদের শাখা-প্রশাখা ও শিকড় মেলে ধরেছে ধর্মান্ধতার অতল গভীরে।

ভ্রষ্ট রাজনীতির ধূর্ত অপকৌশলে জনগণের একাংশকে বিভ্রান্ত করে ধর্মরাষ্ট্রের প্রবক্তা দল ও তাদের শাখা সংগঠনগুলি হয়তো বা সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা যে জনমনে ভ্রান্ত চেতনা সৃষ্টি করে শাসকশ্রেণী দ্বারা শ্রেণীশোষণকে চিরায়ত করা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ ধর্মান্ধতা জনগণকে শেখায় রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র প্রভৃতি শাসকশ্রেণীর শোষণযন্ত্রগুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে। আর ঈশ্বর-আল্লা, স্বর্গ-নরক, পূজা-উপাসনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করতে। ইহলোকের অসাম্য-অবিচার-শোষণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পরলোকমুখী জীবনদর্শন গড়ে তুলতে। আবার জাগতিক স্তরে সাম্প্রদায়িক দাংগা, জাতপাতের লড়াই প্রভৃতিতে আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে বিষিয়ে তুলতে। আর শাসকশ্রেণীও চিরকাল এই পরিস্থিতিই কামনা করে এসেছে। কারণ নিম্নবর্গের উপর উচ্চবর্গের শোষণ-শাসনের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থাকতে পারে না।

পৃথিবীর যেসব দেশে মৌলবাদী ধর্মরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তার কোনটিতেই আজ পর্যন্ত কোনও উন্নত সভ্যতা রচিত হয়নি। কারণ ধর্মরাষ্ট্র বিজ্ঞানমনস্কতা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি, এবং সামগ্রিক ভাবে আধুনিকতার বিরোধী। মৌলবাদী ধর্মরাষ্ট্রের প্রবক্তারা এই মত প্রচার করে থাকে যে *বেদ, কোরান, বাইবেল,* অথবা *তালমুদই* পৃথিবীর সব সম্ভাব্য জ্ঞানের উৎস ও আধার। তাদের মতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাম্য ও স্বাধীনতার উপরে নয়, ধর্মগ্রন্থের উপরেই রাষ্ট্রব্যবস্থা অধিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কারণে পৃথিবীর মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলি আজও ইতিহাসের মিছিলের শেষের সারিতেই দাঁড়িয়ে আছে। আর সেসব দেশে শাসকশ্রেণীর নিরংকুশ অবিচার-অত্যাচার-শোষণ প্রায় চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষের মৌলবাদীরাও একই পথের পথিক। তারাও মূলত হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও মনুবাদী রাষ্ট্রীয় ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে এদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দুরাগ্রহী। অতএব এখানে স্থায়ী ভাবে মৌলবাদী ধর্মরাষ্ট্র কায়েম হলে ভারতবর্ষও স্থায়ী ভাবে ইতিহাসের মিছিলের শেষের সারিতে গিয়েই দাঁড়াবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ষোড়শ শতকের জৈন দার্শনিক মণিভদ্র সুরী যথার্থই বুঝেছিলেন যে ধর্ম ও পরলোক থেকে জনগণ যদি কোনদিন দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, তবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। দাস নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকেই প্রভু জ্ঞান করবে, আর নিজ দাসত্বকে হেলায় দলন করবে। নবচেতনা লাভ করে দরিদ্রও মনে করবে,

পৃথিবীর স্বর্ণরাশি আমার। এই ভেবে সে নিজ দারিদ্রের ধ্বংসের পথ সন্ধান করবে। এভাবে প্রচলিত জগৎব্যবস্থার উচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দেবে। মার্কস্ ও এংগেলস্ বলেছেন যে বিত্তবান শ্রেণীরা বিত্তহীন শ্রেণীদের ইতিহাস চেতনা এবং আত্মশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে আফিমের মতো ব্যবহার করে। আপাত প্রতিকারহীন শ্রেণীশোষণে জর্জরিত মনুষ্য সমাজে ধর্ম শোষিতের দীর্ঘশ্বাস বিশেষ। যা তাকে এক অলীক চৈতন্যে আচ্ছন্ন করে দুঃখে সান্ত্বনা জোগায়। কিন্তু ধর্মের এই ভ্রান্ত চেতনা বৈপ্লবিক গণজাগরণের পরিপন্থী। ধর্ম সম্বন্ধে মার্কস্‌বাদের এই সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। অতএব বিজ্ঞানমনস্ক যেসব মানুষ সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। এই লক্ষ্যে এগুতে হলে শ্রেণীসংগ্রামের স্ট্র্যাটেজির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে, বিশেষত ভারতের মতো ধর্মমোহে আচ্ছন্ন দেশে।

শাসকশ্রেণী যে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার রূপে চিরদিন ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে, রবীন্দ্রনাথ সেকথা বারবার বলে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ *রক্তকরবী* নাটকে রাজা ও তার সর্দারেরা খোদাই শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে গোঁসাইজিকে ব্যবহার করে, তাদের ধর্মের আফিমে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। একই বক্তব্য আরও সরাসরি এবং জোরালো ভাষায় তিনি রেখে গেছেন *রাশিয়ার চিঠিতে*। সেখানে তিনি বলেছেন ঃ "এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে, সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ঃ আলিংগন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।" ধর্মের ভ্রান্ত চেতনা দূর হলে শোষিত মানুষ যে একদিন নিজ বিপ্লবী শক্তিতে উজ্জিবীত হয়ে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, সে ইংগিতও *রক্তকরবীতে* আছে। খোদাই শ্রমিকদের দমনে গোঁসাইজির ভূমিকা সম্বন্ধে পাগলা বিশু বললো ঃ গোঁসাইজি এদের কূর্ম অবতার বললেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, ধর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।" আজ ভারতের শূদ্রশ্রেণী, অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর সামনে কূর্ম অবতারের বেশ ত্যাগ করে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ধর্মাসুরদের বিরুদ্ধে বরাহ অবতারের মূর্তি ধারণের শুভলগ্ন উপস্থিত হয়েছে।

১০

গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়

গণতন্ত্র শব্দটির অনের রকম ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ আছে। অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়ের সংজ্ঞা ও পথ নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে গণতন্ত্র বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি। কিন্তু এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ নেই। কারণ তাহলে মুখ্য আলোচ্য বিষয়টি গৌণ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া বর্তমান ভারতবর্ষের পটভূমিতে ফলিত গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণই প্রাসংগিক এবং ফলপ্রসূ হবে। অতএব বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার স্বার্থে ভারতের সংবিধানে বিধৃত গণতন্ত্রকেই সামাজিক ন্যায়ের তাত্ত্বিক পটভূমি হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে প্রকৃতপক্ষে আমরা বর্তমান ভারতীয় গণতন্ত্রকে, অথবা যে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র থেকে ভারতীয় গণতন্ত্র আহৃত হয়েছে তাকে আদর্শ গণতন্ত্র রূপে গণ্য করি না।

সামাজিক ন্যায়ের কতগুলি সাধারণ আংগিক আছে। যেমন সারা পৃথিবীতেই নারী ও পুরুষের মধ্যে ন্যায়সম্মত সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক এবং আন্দোলন চলছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে এবং ভারতবর্ষে ভূমিপুত্র আদিম অধিবাসী বা আদিবাসীদের প্রতি সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবার সাম্রাজ্যবাদী ক্রীতদাস প্রথার ঐতিহাসিক পটভূমিতে সাদা ও কালো মানুষদের মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের দাবী প্রায় দুশো বছর ধরে অপূর্ণ রয়েছে। এদেশেও এই সব সমস্যাই কমবেশি বর্তমান। কিন্তু এ নিবন্ধে আমরা শুধুমাত্র চাতুর্বর্ণ্যের পরিকাঠামোর মধ্যে আদিবাসী সহ শূদ্রদের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করবো। তবে তার আগে সাধারণ ভাবে সামাজিক ন্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখা

প্রয়োজন। প্রথমত, সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন সামগ্রিক ভাবে সাম্যের প্রশ্নের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। বিশষেত, আর্থিক সাম্যের অবর্তমানে পরিপূর্ণ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা মাত্র। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমজনতার মধ্যে বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক নবজাগরণ এবং ব্যাপক গণআন্দোলনও অপরিহার্য। সামাজিক ন্যায়ের প্রকৃত রূপায়ণ শ্রেণীসংগ্রামের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে প্রতিটি দেশের সামাজিক ন্যায়ের সমস্যার কতগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থাকে। সমাধানের বাস্তব পথ সে বৈশিষ্ট্যগুলিকে অগ্রাহ্য করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

অন্যান্য অনেক দেশের মতোই প্রাচীন ভারতেও এক ধরনের প্রাচীন শ্রেণীবিভাজন তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এদেশের বিশেষ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিবেশে সে শ্রেণীবিভাজনকেই ধর্মের সংগে মিশিয়ে ফেলে নাম দেওয়া হয়েছিল বর্ণ। এভাবেই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা এদেশের প্রাচীন শ্রেণীভেদের সংগে মিশে গিয়ে ধর্মের আবরণে জন্মগত ও প্রায় চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন তথাকথিত উচ্চ বা দ্বিজ শ্রেণী ছিল মোট জনসংখ্যার এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। প্রথম পর্যায়ে কৃষক শ্রেণীকে বৈশ্য বর্ণের মধ্যে ধরা হলেও ক্রমশ ভূমিহীন ও প্রান্তীয় কৃষকদের শূদ্র বর্ণে নামিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মশাস্ত্রের যুগে এসে কৃষিক্ষেত্রে একমাত্র বৃহৎ ভূস্বামী তথা উদ্‌বৃত্ত ফসলের মালিক কৃষি ব্যবসায়ী ছাড়া আর সকলেই শূদ্র হিসেবে গণ্য হতে থাকে। অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক সহ সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষই ছিল শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। ভূমিপুত্র আদিবাসীরাও ছিল এই শূদ্র বর্ণ বা শ্রেণীরই অন্তর্গত। এভাবে জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশই ছিল শূদ্র শ্রেণীর মানুষ। আর আর্থসামাজিক পিরামিডের সুবিশাল তলদেশে নির্বাসিত শূদ্রশ্রেণীর উপরেই নেমে এসেছিল মুষ্টিমেয় শিকারি আর্যশ্রেণীর অমানবিক শোষণশাসন। সে নিদারুণ শোষণশাসনকে ন্যায়সম্মত রূপ দিয়ে জনমনে প্রোথিত করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এক অকরুণ ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেই এই অমানবিক ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সূত্রপাত। যদিও অনেকে বলে থাকেন যে এই পুরুষসূক্তটি আদি ঋগ্বেদে পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু এ মতের সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। এই সূক্তের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে যে আদি পুরুষকে খন্ড খন্ড করে কাটা হলে তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হলো, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি হলো, উরুদেশ থেকে বৈশ্য

উৎপন্ন হলো, আর পদদ্বয় থেকে উৎপন্ন হলো শূদ্র। এভাবে পবিত্রতম এবং উচ্চতম অংগে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অপবিত্রতম তথা নিম্নতম অংগে শূদ্রের জন্মের তত্ত্বের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা হলো যে মানবসমাজের আর্থসামাজিক কাঠামোর বিন্যাসে সকলের উপরে অবস্থান ব্রাহ্মণের, আর সকলের নিচে শূদ্রের। মধ্যবর্তী স্থানে অধিষ্ঠান ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের। পৃথিবীতে ভোগসুখও দৈব বিধানে সেভাবেই বিন্যস্ত। অর্থাৎ ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের নিয়মে শূদ্রের ভাগ্যে পড়েছে শুধুই দাসত্ব ও দারিদ্র।

মনুস্মৃতি এবং *ভগবদ্‌গীতায়ও* একই ধরনের বানানো ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে আর্য শাসকশ্রেণী দ্বারা নিজেদের শোষণশাসনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। মনু বলেছেন যে সৃষ্টির আদিতেই পরমেশ্বর বিভিন্ন বর্ণের মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, আর শাস্ত্রনির্দিষ্ট সেসব স্বকর্মে নিযুক্ত থাকাই হচ্ছে মানুষের স্বধর্ম। ব্রাহ্মণের জন্য পরমেশ্বর কাজ নির্দিষ্ট করেছেন শাস্ত্ররচনা, বেদপাঠ, যজ্ঞ করা এবং দান গ্রহণ করা। ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, যুদ্ধ করা, যজ্ঞ করা, এবং দান করা। বৈশ্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন, যজ্ঞ করা এবং দান করা। আর শূদ্রের জন্য যে একমাত্র কাজ পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে চিরতরে ঠিক করে দিয়েছেন তা হলো উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা। একই ভাবে *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীভগবান চরিত্রের মুখে বলানো হয়েছে যে স্বয়ং তিনিই মানুষের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের জন্য যেসব কর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা কেবল মনুস্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি। একই ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব *রামায়ণ-মহাভারতে* এবং সবকটি পুরাণে বার বার উচ্চারিত হয়েছে।

এভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ধর্মের নামে যে শিকারি রাজনীতি এবং সমাজনীতি রচিত হয়েছিল, তার মূল লক্ষ্যই ছিল মুষ্টিমেয় পরগাছা আর্যদের দ্বারা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী, অর্থাৎ শূদ্রশ্রেণীর শোষণ। যে শূদ্রশ্রেণী ছিল জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। শূদ্রশ্রেণীর দমন ও শোষণকে ধর্মসম্মত রূপ দিয়ে যেসব বিধি-বিধান রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি কুপরিকল্পিত কাঠামো ছিল। প্রথমত, শূদ্রদের বেদপাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যেহেতু তখন বেদ বলতে জ্ঞান বোঝাতো, এবং বেদগ্রন্থগুলিই ছিল সব রকম জ্ঞানের একমাত্র উৎস, বেদপাঠ নিষিদ্ধ করার অর্থ ছিল শিক্ষা থেকে আমজনতাকে বঞ্চিত করে তাদের ধীশক্তি এবং আত্মচৈতন্যকে স্তব্ধ করে রাখা, আর এভাবে তাদের

শ্রেণীশোষণকে চিরায়ত করা। দ্বিতীয়ত, শূদ্রের বিত্ত সঞ্চয়ের অধিকার ছিল না। রাজা এবং ব্রাহ্মণকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল শূদ্রের বিত্ত কেড়ে নেবার। এভাবে জনসাধারণের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ শূদ্রশ্রেণীকে চিরকাল নিঃস্ব করে রেখে এই সর্বহারাদের উদ্‌বৃত্ত শ্রমমূল্য সংখ্যাল্প আর্যশ্রেণী দ্বারা আত্মসাতের পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, শূদ্রের পক্ষে অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ ছিল। এই কাজ মূলত ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকে অস্ত্রধারণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শূদ্রকে কদাপি নয়। বলা বাহুল্য, শূদ্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা অংকুরে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়েছিল। চতুর্থত, শূদ্রের স্বর্গে যাবার, এবং যজ্ঞ ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অধিকার ছিল না। এভাবে ধর্মশাস্ত্রের আবরণে শূদ্রশ্রেণীকে সব দিক থেকে আর্যশ্রেণীর শিকারে পরিণত করা হয়েছিল। খাজনার হার, অপরাধ ও বিচার ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার এবং সম্বোধনের ভাষা প্রভৃতি সমস্ত রকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে চরম এবং অভাবনীয় সব নেতিবাচক বৈষম্যের বিধান ধর্মের আবরণে শূদ্রশ্রেণীর বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী দ্বারা প্রযুক্ত হয়েছিল।

আর্যদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের যুগে চার বর্ণের নিচে এক পঞ্চম শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদের বলা হতো অতিশূদ্র, অবর্ণ, পঞ্চম, অন্ত্যজ, স্বপাক অথবা অস্পৃশ্য। এদের আর্থসামাজিক স্থানাংকই ছিল আর্যদের শ্রেণীশোষণের চূড়ান্ত নিদর্শন। ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী এরা গ্রামের বাইরে বাস করবে, মৃতের জামাকাপড় পরবে, আর্য নয় শুধু এমন লোকের হাত থেকে খাবার পাবে এবং সে খাবার ভাংগা থালায় খাবে, গায়ে কালো লোহার গয়না পরবে, শুধু নিজেদের মধ্যে বিবাহ এবং সামাজিক আদান-প্রদান করবে, দিনের বেলা শরীরে নিজ জাতের চিহ্ন লাগিয়ে একমাত্র কাজে যাবার জন্যই চলাফেরা করতে পারবে, আর রাত্তিরে একেবারেই চলাফেরা করতে পারবে না।

ধর্মশাস্ত্রকারেরা এও জানতেন যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শাসক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সমঝোতা না থাকলে শূদ্রশ্রেণীকে দীর্ঘকাল বশে রাখা সম্ভব হবে না। মনু অতএব বিধান দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যেন পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে। এই দুই বর্ণ পরস্পরের সংগে সর্বদা সহযোগিতা করে চললে তাদের উভয়ের ইহকাল এবং পরকালের সব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর পারস্পরিক সহযোগিতায় অপারগ হলে উভয় বর্ণই বিনষ্ট হবে। ধর্মশাস্ত্রকারেরা এ বিধানও দিয়েছেন যে সৃষ্টিকর্তা দ্বারা নির্দিষ্ট চাতুর্বর্ণ্যের কর্মবিভাজন এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক বিধান বলবৎ রাখা, আর এসব অমান্য

করলে গুরুতর শাস্তিবিধান রাজাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। এভাবে রাষ্ট্রশক্তি ও শাস্ত্রশক্তিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করে প্রাচীন ভারতের শাসকশ্রেণী তাদের ব্যাপক শ্রেণীশোষণ অব্যাহত রেখেছিল। আর এভাবেই সংখ্যালঘু আর্য এবং সংখ্যাগুরু শূদ্রে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ দাঁড়িয়েছিল চরম শ্রেণীশোষণ, অন্যায় ও অবিচারের উপরে।

গুপ্তযুগের পর থেকে রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতার ফলে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে মূল চার বর্ণের ভেতর থেকে ক্রমশ অনেক জাতির উৎপত্তি হয়। ফলে, শূদ্রশ্রেণীর আর্থসামাজিক স্থানাংকের সামান্য উন্নতি হয়। কিন্তু দ্বিজ আর্যদের সংগে তাদের আর্থসামাজিক বৈষম্য বহু শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিত থেকে যায়। অতিশূদ্র বা অস্পৃশ্যদের দুর্দশার লাঘব হবারও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দালনে শূদ্রশ্রেণীর প্রতি, বিশেষত তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রতি কিছুটা দয়া, প্রেম বা করুণা প্রচার করা হয় সত্যি। কিন্তু ভক্তি আন্দোলন মূলত ভাববাদী স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল বলে এর ফলে আর্থসামাজিক কাঠামোর কোনও পুনর্বিন্যাস সম্ভব হয়নি এবং এই কাঠামোতে অস্পৃশ্যদের অথবা সামগ্রিক ভাবে শূদ্রশ্রেণীর আর্থসামাজিক স্থানাংকের কোনও পরিবর্তন হয়নি। উনিশ শতকের ধর্মীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়েও আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর কোনও প্রকৃত আঘাত আসেনি, এবং অদ্বৈতবাদ প্রচারের সংগে শূদ্র ও অতিশূদ্রের জাগতিক পরিস্থিতির কোনও মিল ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজির নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কিছুটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা তৎকালীন ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে আর্থসামাজিক কাঠামোকে সামগ্রিক ভাবে নাড়া দিতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে শূদ্রশ্রেণীর কিছুটা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলেও অতিশূদ্রদের দমন-পীড়ন সমান ভাবেই চলে এসেছে।

স্বাধীনতার পরে ডঃ বি আর আমবেডকরের উদ্যোগে ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাদের জাগতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে শূদ্রশ্রেণীর নিপীড়িত আর্থসামাজিক অবস্থান তথাপি অপরিবর্তিত থেকে যায়। পরবর্তীকালে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর থেকেই সামগ্রিক ভাবে শূদ্রশ্রেণীর প্রতি সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কিছুটা সুবিচার আরম্ভ হয়। ১৯১১ সালের মন্ডল কমিশনের রিপোর্টে জনসংখ্যার যে ৫২ শতাংশকে

অনগ্রসর শ্রেণী হিসেবে, ১৫ শতাংশকে তপশিলী হিসেবে, আর ৭.৫ শতাংশকে তপশিলী উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারাই যুক্তভাবে (অর্থাৎ জনসাধারণের ৭৪.৫ শতাংশ) বর্তমান শূদ্রশ্রেণী। যাদের সনাতন ঈশ্বরনির্দিষ্ট ধর্ম শুধু উৎপাদনশীল কঠোর শ্রমের মাধ্যমে পরগাছা উচ্চবর্ণদের উদ্‌বৃত্ত শ্রমমূল্য সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রশক্তির অনেক উত্থানপতন, তাত্ত্বিক বাতাবরণে অনেক অদ্বৈতবাদ এবং মানবতাবাদ, আর সমাজসংস্কারকদের অনেক আপাতচেষ্টার পরেও এই বিপুল শূদ্রশক্তি ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে আজও তথাকথিত উচ্চবর্ণদের দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ। আর শূদ্রশক্তির এই বদ্ধদশাই যে ভারতের আর্থসামাজিক অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা এ নিবন্ধের শুরুতেই বলেছি যে শেষ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামের কাঠামোর মধ্যেই এদেশে সামাজিক ন্যায়ের সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু একই সংগে একথাও বলেছি যে ভারতে শ্রেণীসংগ্রামের সঠিক পন্থা এবং আংগিকগুলি নির্ধারণ করতে হলে এদেশের ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির বাস্তববাদী মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সে বৈশিষ্ট্যগুলিকে শ্রেণীসংগ্রামের অপরিহার্য আংগিক হিসেবে গ্রহণ করলেই এদেশে শ্রেণীসংগ্রাম সফল হওয়া সম্ভব। আর একমাত্র সে পথেই ভারতের বিশেষ ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অনাদি কাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা অমানবিক সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাস্তবধর্মী শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর সব দেশেই উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে ভিত্তি করে যে শ্রেণীচরিত্র গড়ে ওঠে, তার সংগে সেসব দেশের সামাজিক বিন্যাস অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে এদেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ধনতান্ত্রিক শ্রেণীকাঠামোর মধ্যে এখনও পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রই প্রবলতর। আর এই সামন্ততন্ত্রই শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার রূপে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং তার উপর গড়ে ওঠা জাতিভেদ প্রথাকে প্রশ্রয় দেয়। আবার ধনতন্ত্রের সার্বিক আর্থিক অসাম্যের মধ্যেও ভারত ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত জাতিভেদ প্রথার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অতএব শেষ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সাম্য বা সামাজিক ন্যায় কোনটিই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র

অর্থনৈতিক নিরিখে এদেশের বিশেষ ধরনের শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ আগেই দেখানো হয়েছে যে শ্রেণীভেদ-জাতিভেদ সম্পর্কের অন্যতম প্রধান উৎস ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীরে নিহিত আছে।

বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সমীক্ষা থেকে সন্দেহাতীত ভাবে জানা গেছে যে অর্থনৈতিক নিরিখে অনগ্রসর বা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ জাতিবর্ণের বিচারেও শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। তেমনি ভাবে অতিশূদ্র বা দলিত এবং আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই একই সংগে দরিদ্রতম শ্রেণীরও মানুষ। শিক্ষার মানদণ্ডেও একই ছবি পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে মানুষের শ্রেণীগত অবস্থান এবং জাতিবর্ণগত অবস্থানের মধ্যে নিবিড় তথা সন্দেহাতীত কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। প্রশ্ন এই, এদেশের মানুষের শ্রেণীগত অবস্থান তার জাতিগত অবস্থানকে নির্ধারিত করছে, না তার জাতিগত অবস্থান তার শ্রেণীগত অবস্থানকে নির্ধারিত করছে। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী মত আছে। বিশ্বজনীন ইতিহাসের মানদণ্ডে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীসংগ্রামের সমধিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে এই সত্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে এদেশের শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে শূদ্রমুক্তির সংগ্রামকে বুনে না দিলে সে শ্রেণীসংগ্রাম সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

অর্থনৈতিক বিচারে যাকে শ্রেণী বলা হয়, এদেশে তার প্রতিটির মধ্যে প্রায় অসংখ্য জাতি রয়েছে। আর সেসব জাতির মানুষেরা নিজেদের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরিখে উঁচুনিচু ভেদাভেদের ভ্রান্ত চৈতন্যে জর্জরিত এবং বহুধা বিভক্ত, এমনকি পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত। শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ মদতে প্রাচীন কাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারের এই অপসংস্কৃতি এক পুঞ্জীভূত এবং শীলীভূত রূপ ধারণ করেছে। নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক পরম্পরায় এই অপসংস্কৃতির কাঠামো এক প্রায় স্বতন্ত্র এবং গতিময় অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতএব এই কাঠামোয় আঘাত না হেনে শুধুমাত্র উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশে সার্বিক সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এদেশে শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ মাত্রই জানেন যে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের অনেক পরেও জাতপাতের অপসংস্কৃতির কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। যেসব ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র দানা বেঁধেছে, সেখানেও আছে জাতিভেদের প্রাবল্য। এমনকি যেসব অন্য অর্থে প্রগতিশীল

মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত আছেন তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রেই জাতপাতের অপসংস্কৃতি ভালো ভাবেই বেঁচে থাকতে দেখা যায়। ধর্মীয় কুসংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অপসংস্কৃতির কাঠামো এদেশে এতোই শক্তিশালী।

এই পরিস্থিতিতে শ্রেণীভেদের কাঠামো এবং জাতিভেদের কাঠামোর মধ্যে এক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জাতিভেদের কাঠামো এমন একটি ধর্মীয় কুসংস্কার ভিত্তিক অপসংস্কৃতি দিয়ে নির্মিত যা প্রাচীন কাল থেকে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের, অর্থাৎ শূদ্র ও অতিশূদ্রদের, বাধ্য করেছে সবচেয়ে কম আয়ের হাতের কাজের পেশাগুলিতে নিযুক্ত থাকতে। ঈশ্বরের বিধানের নামে এভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে চিরদারিদ্র। অন্যদিকে আবার তাদের এই চিরদারিদ্র তাদের সামাজিক হীনস্থানকে চিরস্থায়ী করে তুলতে সাহায্য করেছে। একথা ধ্রুব সত্য যে উন্নত স্তরের শ্রেণীচেতনা জন্মালে মানুষের জাতিভেদ চেতনা সে পরিমাণেই লোপ পেতে বাধ্য। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে জাতপাতে বিশ্বাস মানুষের শ্রেণীচেতনাকে অনিবার্য ভাবেই প্রতিহত করে। একই শ্রেণীর মানুষেরা জাতপাতের উঁচুনিচু বিভাজনে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হয়। আর এভাবে শ্রেণীচেতনা, শ্রেণী ঐক্য এবং শ্রেণীসংগ্রামকে পংগু করে তোলে। অতএব ভারতবর্ষের শ্রেণীসংগ্রাম এদেশের জাতিশোষণ বিরোধী সংগ্রাম, বিশেষত শূদ্রমুক্তির সংগ্রামের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

এ প্রসংগে সংরক্ষণের প্রশ্নও অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে শ্রেণীহীন সমাজে জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণ অপ্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত। কিন্তু যেদেশে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী অনাদিকাল থেকে নেতিবাচক বৈষম্যনীতির মাধ্যমে বিপুল শূদ্রজনতাকে আর্থসামাজিক পিরামিডের বিপুল পাদদেশে নির্বাসিত করে রেখেছে, সেদেশে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামের আংগিক হিসেবেই সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের জন্য কিছুটা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজন। বর্তমান ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে অতিশূদ্রসহ শূদ্রজনতার পক্ষে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক সাম্যে সন্তুষ্ট থাকা অথবা পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রতীক্ষায় আর্থসামাজিক সুরক্ষাহীন শ্রেণীসংগ্রামে আস্থা রাখা কঠিন। যুগযুগান্তরের সুকঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে তাদের জাগতিক উন্নতি ত্বরান্বিত না হলে সামাজিক শৃংখলমুক্তিও সুদূর পরাহত। শ্রেণীসংগ্রামের

সাংবিধানিক আংগিক হিসেবে অতএব সনাতন নেতিবাচক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইতিবাচক বৈষম্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আর এরই নাম সংরক্ষণ নীতি। ভারত ইতিহাসের বিশেষ বাস্তব প্রেক্ষাপটে তাই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে নীতিগত ভাবে গ্রহণ এবং সক্রিয় ভাবে রূপায়ণ ছাড়া যে কোনও শ্রেণীসংগ্রাম অবাস্তব ও অসফল হতে বাধ্য।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ সত্যও বেরিয়ে আসছে যে এদেশে শ্রেণীসংগ্রামের অন্যতম প্রধান আংগিক হিসেবে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লবও অপরিহার্য। অতি প্রাচীন কাল থেকে যে বানানো ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং পৌরাণিক অবতারের কল্পকাহিনী ও বাণী ব্যবহার করে শাসকশ্রেণী আমজনতাকে বশে রেখে শোষণ করেছে, রাষ্ট্রশক্তি ও শাস্ত্রশক্তির যৌথ প্রচারে কালক্রমে জনসাধারণ সেসব মিথ্যাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে। আদি চার বর্ণ অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারকে আশ্রয় করে কালক্রমে অগণিত জাতি-উপজাতির জটিল কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়েছে। এই ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অপসংস্কৃতির কাঠামো এতোই শক্তিশালী যে বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক স্তরে এর উপর জোরালো আঘাত না হানলে এ কাঠামো শ্রেণীসংগ্রামের পথে অচল অবরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতএব ব্যপক বৈজ্ঞানিক গণশিক্ষা এবং গণআন্দোলনের মাধ্যমে জাতপাতে বিশ্বাসের অপসংস্কৃতির কাঠামোর উপর প্রবল আঘাত হানাও শ্রেণীসংগ্রাম তথা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য। আর যে ধর্মবিশ্বাস থেকে এই অপসংস্কৃতির উ ৎপত্তি, শেষ পর্যন্ত সে ধর্মের বিকল্প হিসেবে ধর্মহীন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি প্রচার করতে লোকভয়ে বিমুখ হলে শ্রেণীসংগ্রাম, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সর্ব অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে যাবে। অর্থাৎ এদেশের বাস্তব ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন, সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব সবই শ্রেণীসংগ্রামের অপরিহার্য আংগিক হিসেবে গণ্য হলে তবেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি এই সিদ্ধান্তও অনিবার্য হয়ে পড়বে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের কাছে সাধারণ ভাবে এদেশের শূদ্রশ্রেণী, বিশেষত অতিশূদ্র বা দলিতশ্রেণী রাজনৈতিক সহজমিত্র। একথা তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া উভয়দিক থেকেই মৌলিক সত্য। শূদ্রশক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে এদেশে কোনও শ্রেণীসংগ্রাম সফল হবার আশা দুরাশা মাত্র। এদেশের শূদ্রশ্রেণী, বিশেষত অতিশূদ্র বা দলিতশ্রেণী যদি সর্বভারতীয় স্তরে বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিগুলি থেকে দূরে সরে থাকে, তবে তা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার পরিচয় মাত্র, এবং সে দূরত্ব ঘুচিয়ে শূদ্রশক্তিকে আপন করে নেওয়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শক্তিগুলির আশু কর্তব্য। কারণ ভারতের শূদ্রশ্রেণীর চেয়ে, বিশেষত দলিত ও আদিবাসী শ্রেণীর চেয়ে বেশি সর্বহারা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

১১

ধর্ম ও ধর্মান্ধতা

বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্ম থেকে ধর্মান্ধতা, এবং ধর্মান্ধতা থেকে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা জন্মলাভ করে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় কলুষিত করে তুলেছে। আর এভাবে জনসাধারণকে বহুধা বিভক্ত করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ধনতান্ত্রিক শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের বৈপ্লবিক ঐক্য এবং অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করছে। অথচ এদেশেই একদিন শক্তিশালী ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। বৃহস্পতি, চার্বাক, জাবালি প্রমুখ প্রাচীন ভারতের কয়েকজন মনীষী দার্শনিক এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে ধর্মচেতনা এক বিশেষ ধরনের ভ্রান্ত চেতনা। অতএব তাঁরা লোকায়ত দর্শন নামে এক ধর্মবিরোধী সমাজদর্শন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই লোকায়ত দর্শনের মূল বক্তব্য ছিল যে বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ যারা রচনা করেছিল, তারা ছিল ধূর্ত, ভন্ড এবং নিশাচর (এয়ো বেদস্য কর্তারো ধূর্তভন্ডনিশাচরাঃ)। পুরোহিতদের দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্র প্রভৃতি শুধুমাত্র অর্থহীন হাজরবাজর (জর্ভরিতুর্ফরীত্যাদি)। আর সামগ্রিকভাবে ধর্ম বুদ্ধিহীন এবং পৌরুষহীন মানুষদের জীবিকা নির্বাহের একটা চতুর পন্থা মাত্র (বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা)। এই লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে আমরা *রামায়ণ-মহাভারতে* এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক গ্রন্থে বৃহস্পতি, চার্বাক এবং জাবালির উল্লেখ পাই। মধ্যযুগে মাধবাচার্য রচিত *সর্বদর্শন সংগ্রহ* নামক গ্রন্থে এই লোকায়ত দর্শনকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে জনসাধারণের মন থেকে এই দর্শনের প্রভাব দূর করা অত্যন্ত কঠিন (দুরূচ্ছেদ্যং হি চার্বাকচেষ্টিতম্)।

আধুনিক যুগে মার্ক্স, এংগেলস ও লেনিন একই ধরনের মতবাদ প্রচার

করেছেন। যদিও তাঁদের ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং সমাজদর্শন ছিল স্বভাবতই প্রাচীন কালের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। মার্ক্স এবং এংগেল্স বলেছেন যে বিত্তবান শ্রেণীরা বিত্তহীন শ্রেণীদের ইতিহাস-চেতনা এবং আত্মশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে আফিমের মত ব্যবহার করে। আর বিত্তহীন শ্রেণীর শোষিত মানুষেরা অলীক ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে নিজ ঐতিহাসিক অবস্থান, দুরবস্থা ও দুঃখকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। ধর্ম শোষিতের দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু বৈপ্লবিক গণজাগরণের পরিপন্থী। মার্ক্সবাদ অতএব ধর্মচেতনার বিরোধী। লেনিন মূলত ধর্মের বিরোধী হলেও অবশ্য ধর্মকে জোর করে তুলে দেবার বিরোধী ছিলেন। রুশ বিপ্লবের পরে যে সাড়ে ছয় বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তার মধ্যে ধর্মবিরোধী প্রচারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এমনকি এই মতও প্রকাশ করেছিলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে যেসব যুক্তিবাদী দার্শনিক ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের পুঁথিপুস্তক রুশ ভাষায় অনুবাদ করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা উচিত। কিন্তু শুধুমাত্র প্রচারের অতিরিক্ত কোন জোর-জবরদস্তির তিনি বিরোধী ছিলেন।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকেই মানুষের মনে ধর্মচিন্তার উৎপত্তি হয়। অসহায় শিশুকে নানা-রকম পারিপার্শ্বিক আপদ-বিপদ এবং উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা করেন মাতাপিতা। এভাবেই মাতাপিতার সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে শৈশবে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই নির্ভরশীলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। কারণ যে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে সে পদার্পণ করে, সেখানেও নিরাপত্তার অভাব থেকেই যায়। মানব সমাজের বিন্যাস এবং উন্নতি কোন দেশেই আজ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছোয়নি যে সেখান থেকে ব্যক্তিমানুষের সব রকম নিরাপত্তার অভাব এবং উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেছে। অতএব সর্বত্রই অধিকাংশ মানুষ আজও জীবনের সুরক্ষার জন্য কোনও কাল্পনিক জীবনপিতা কিংবা বিশ্বমাতার উপর মানসিক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আর এখানেই আছে ধর্মচেতনার উৎস। তবে অসম আর্থসামাজিক বিন্যাসের ফলে যেসব দেশে দারিদ্র, শোষণ ও অবিচার বেশী, সেসব দেশ ও সমাজে স্বভাবতই ধর্মচেতনার প্রাবল্যও বেশী। আমাদের ভারতবর্ষ এমনি এক দেশ। তাই এদেশের সমস্যাজর্জরিত মানুষের মনে বর্তমান কালে ধর্মচিন্তার প্রকোপ এত বেশী।

এই ধর্মচেতনা নিঃসন্দেহে মানুষের ইতিহাস চেতনাকে প্রতিহত করে। পৃথিবীর মানুষের দারিদ্র্য-যন্ত্রণা, অবিচার-অত্যাচার এবং শোষণ-শাসন থেকে

মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ম মানুষকে কাল্পনিক পরলোকের দিকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলে। তাকে ভাবতে শেখায় যে তার জীবন-যাতনা ঈশ্বরের বিধান। ফলে অন্যায়-অবিচারের জাগতিক কাঠামো অপ্রতিহত এবং চিরায়ত হয়ে দাঁড়ায়। আর এই উদ্দেশ্যেই কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকেরা আমজনতাকে অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে তাদের ধর্মচিন্তাকে উৎসাহিত করে। কারণ যতদিন তারা নিজ দুরবস্থার জন্য দৈবকে দায়ী করে বৈপ্লবিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে, ততদিন কায়েমী স্বার্থদের সুখনিদ্রায় বিঘ্ন ঘটবে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক-শাসকশ্রেণী অতএব গণশক্তিকে বহুধা বিভক্ত এবং দুর্বল করে রাখবার উপায় হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে। অলীক ধর্মচেতনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে শোষিত মানুষ যেদিন ইতিহাসের রথের রশি নিজের হাতে তুলে নেবে, সেদিনই জন্ম নেবে মানুষের প্রকৃত ইতিহাস।

সুদূর ভবিষ্যতে যেদিন দারিদ্রহীন এবং শোষণহীন সমসমাজ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন ব্যক্তিমানুষের সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে। ফলে তার জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ এবং উৎকণ্ঠাও অনেক পরিমাণে দূর হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক জনশিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ক্রমশ বিশ্বভুবনের আপাত রহস্যও বুঝতে শিখবে। এভাবে ধর্মচেতনার উৎস বিলুপ্ত হলে ধর্মের অলীক দর্শনও মানুষের মন থেকে একদিন হয়ত বা আলেয়ার মতই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তথাপি একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে অদূর ভবিষ্যতে কোনও দেশেই এমন আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ সম্ভব হবে না যেখান থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ এবং অতএব ধর্মচেতনা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। বিশেষত ভারতবর্ষের মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ধনতান্ত্রিক দেশে সম্ভাব্য বৈপ্লবিক এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পরেও আদর্শ আর্থসামাজিক কাঠামো নির্মাণ করতে বহু সময়ের প্রয়োজন হবে। অতএব ধর্মচেতনাও এদেশে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। যাঁরা এদেশে সার্বিক গণমুক্তির আদর্শে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের পক্ষে তাই জনসাধারণের এই ধর্মচেতনাকে কঠিন বাস্তব হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই কঠিন সত্যকে মেনে নিয়েই গণসংগ্রামের পদ্ধতি স্থির করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক এবং দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে এদেশের গণমুক্তি অনিবার্য ভাবেই বিলম্বিত হবে।

এ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে রুশ বিপ্লবের পরে লেনিন ধর্মবিরোধী

প্রচারে উৎসাহ দিলেও এ ব্যাপারে সবরকম জবরদস্তি এড়িয়ে চলবার পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের দেশেও এই নীতিকেই মৌলিক এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতি হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কোনও সাময়িক লাভের আশায় কখনোই ধর্মের সংগে আপোষ করে চলা উচিত নয়। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে ধর্মের সব রকম প্রকাশ দেশ ও সমাজের পক্ষে সমান ক্ষতিকর নয়। অতএব ধর্মবিরোধী প্রচার এবং কার্যক্রমের মধ্যেও স্তরবিন্যাস থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ধর্মবিশ্বাস যখন শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ঘরের বাইরে এসে সামাজিক বিস্তার লাভ করে না, অথবা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে না, তখন সে ধর্ম সামগ্রিকভাবে মানুষের বৈপ্লবিক চেতনার পরিপন্থী হলেও তা সাময়িকভাবে দেশ ও সমাজের কোন গুরুতর ক্ষতি করতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানভিত্তিক লোকশিক্ষা এবং ইতিহাস চেতনার প্রসারের মাধ্যমে এ ধরনের ধর্মচিন্তার অসারতা সম্বন্ধেও জনসাধারণকে সচেতন করে তুলবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচেতনার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণের প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে ধর্মের যে বহিঃপ্রকাশ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয়, এবং রাজনীতির অন্দরমহলে প্রবেশ করে গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাকেই ধর্মান্ধতা বলা যায়। এ ধরনের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে গণশক্তিকে সুসংহত করে জোরদার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পেছনে সর্বদাই একটা আর্থসামাজিক শোষণ-শাসনের কাঠামো বর্তমান থাকে। আর কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকেরা নিজ শ্রেণীস্বার্থকে চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যেই ধর্মকে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক সত্য এই যে বিত্তহীনেরাই সর্বদা সাম্প্রদায়িক দাংগা প্রভৃতির বলি হয়ে থাকে। বিত্তাবানেরা নিজ শ্রেণীস্বার্থে দাংগায় উস্‌কানি দিয়ে যথাসময়ে নিজেদের ধনসম্পত্তি নিয়ে সরে পড়ে অথবা উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বিদগ্ধ আলোচনা চক্র হয়ত বা বুদ্ধিজীবীদের বিলাস। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য বিত্তহীন মানুষের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা জীবনমরণের সমস্যা। অতএব সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই তাদের বাঁচার লড়াই।

ইংরেজ সরকারের মদদপুষ্ট ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থেরা একসময় ধর্মের নামে দেশ ভাগ করে কোটি কোটি মানুষের জীবনমরণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। এই উপমহাদেশের অগণিত মানুষ জীবনের বিনিময়ে ধর্মান্ধতার যে বিরাট মূল্য দিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় আর কোথাও কোনদিন এত মানুষকে সে মূল্য দিতে হয়নি। তথাপি আজ আবার যখন ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এদেশের মাটিতে আত্মপ্রকাশ করছে, তখন ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে তার উপর সরাসরি আঘাত হানবার সময় এসেছে। রামচন্দ্র নামে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এদেশে কখনও জন্মাননি। *রামায়ণ* সম্পূর্ণই মহাকবি বাল্মীকির কপোলকল্পিত মহাকাব্য। যার সংগে আবার হোমার রচিত *ইলিয়াড* মহাকাব্যের অনেক মিল আছে। রামায়ণের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। একথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নীরদ চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন। বর্তমান লেখকও তথ্য প্রমাণ দ্বারা ভিন্ন গ্রন্থে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তথাপি যখন দেখি যে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা শহরে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে রামচন্দ্রের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইন্ধন জোগানো হচ্ছে, তখন শুধু যে আমাদের অন্তরাত্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাই নয়, এ ধরনের ধর্মান্ধ রাজনীতির অন্তরালে অবস্থিত কায়েমী স্বার্থদের চিনে নিতেও আমাদের বিলম্ব হয় না। আবার আমাদের শংকরাচার্যেরা যখন ধর্মের নামে সতীদাহ এবং দলিত নির্যাতন সমর্থন করেন, তখনও মৌলবাদের মুখোশের আড়ালে ধর্মাসুরদের আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই।

ধর্মান্ধতার রাজনীতি সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে। এই দুই রাজ্যেই রাজনৈতিক বিচ্ছেদকামী স্বার্থান্বেষী আর্থসামাজিক শক্তিরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সক্রিয় সহযোগিতায় ধর্মীয় মৌলবাদের মুখোশের আড়ালে এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলবার বেপরোয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিত্তহীনদের ভাগ্যোন্নতি কিংবা মানব মুক্তির কোনও সামগ্রিক আদর্শের চিহ্নমাত্র নেই। আছে শুধু পুরোহিততন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র আর ধনতন্ত্রের পশ্চাৎমুখী প্রতিশ্রুতি। এই দুই রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ধর্মান্ধতার রাজনীতি আজ আর শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে সীমাবদ্ধ নেই। সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংগে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। আনন্দমার্গ, ইসকন্ প্রভৃতি মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠনগুলিকেও

সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি সাহায্য করছে এবং এদের সাহায্যে এদেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক্ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

এদেশে যারা আজ ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী রাজনীতি প্রচার করছে তারা নিঃসন্দেহে গণশত্রু। আর এই সংঘবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যপুষ্ট গণশত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅভিযানের সময় উপস্থিত হয়েছে। তাই ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী আন্দোলন এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের আজ ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপর কঠিন আঘাত হানবার জন্য এক সংগে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কঠিন সংগ্রামের কোনও বিকল্প নেই। আর এ আহ্বান রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন আগেই জানিয়ে গেছেন তাঁর 'ধর্মমোহ' কবিতায় ঃ

"অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
প্রলয়ের ওই শুনি শংখধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী। ....
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে, —
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

১২

পুঁজিবাদই কি ইতিহাসের শেষ আদর্শ?

গত দুতিন বৎসরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আকস্মিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বিদেশ নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তির একক এবং যৌথ চাপ সৃষ্টি করা ছাড়াও ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক এবং আই.এম.এফ.কে ব্যবহার করে পৃথিবীর অন্য সব দেশের উপর, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর, পুঁজিবাদী আদর্শ এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি আজ বদ্ধপরিকর। এই চেষ্টায় ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে তারা ইতিমধ্যেই কিছুটা সফলতাও অর্জন করতে পেরেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন যে পুঁজিবাদই পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র সফল ও সম্ভাব্য আদর্শ, সমাজতন্ত্রের আদর্শ পৃথিবী থেকে এখনও একেবারে উঠে না গেলেও এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বছর দুই আগে একজন জাপানী আমেরিকান এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন যে মানব সভ্যতার ইতিহাস তার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কারণ পুঁজিবাদ এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্র পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে প্রমাণিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এর চেয়ে উন্নততর আর কোনও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রচিত হবার সম্ভাবনা নেই। তার এই বক্তব্য ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দ্বারপাল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এবং এদেশে তাদের অন্নভোজী ও তল্পীবাহকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

কিন্তু বলা বাহুল্য, এই অর্বাচীন মত চরম ইতিহাস বিমুখতা এবং

নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে তুলনাক্রমে সাম্প্রতিক কালের আগে ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাসের অমোঘ গতিতে আবার ভবিষ্যতেও অনিবার্য ভাবেই ধনতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটবে। পুঁজিবাদ ইতিহাসের একটি বিশেষ খন্ডকালে ইউরোপের কয়েকটি দেশের বাস্তব আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, এবং একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে, অথবা সেসব দেশেই অন্য কালে, পুঁজিবাদ ছিল না। থাকবেও না। বর্তমান পৃথিবীর পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও ভবিষ্যতে এই আদর্শের অবক্ষয় এবং মৃত্যুই স্বাভাবিক। বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাথে তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার চিন্তাধারা এবং আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। অতএব ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা, ভোগবাদ, এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মাৎস্যন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদের মানবতা বিরোধী আদর্শ ইতিহাসের শেষ আদর্শ হতে পারে না।

এই মৌল ও অকাট্য সত্য মনে রাখবার প্রয়োজন আছে যে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে অবিচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে গড়ে উঠেছে। ধনতন্ত্র ইউরোপে গড়ে ওঠবার আগেই স্পেন ও পর্তুগাল এবং অল্প পরে হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক লুট আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। অনেক প্রখ্যাত ইতিহাস ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ অকাট্য তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক লুট থেকে আহরণ করা বিরাট অঙ্কের পুঁজির সাহায্য ছাড়া ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হত না। বিশেষত পূর্ব ভারত থেকে লুটের বিপুল পুঁজির ভান্ডার না পেলে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হত না। তারপর ধনতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি ঔপনিবেশিক লুটের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মাধ্যমে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকাকে কাঁচা মালের উৎস এবং শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের বাজারে রূপান্তরিত করে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যুগপৎ বিকশিত হতে থাকে। উত্তর আমেরিকায় অবশ্য বাস্তব ঘটনা ছিল একটু আলাদা। সেখানে সাম্রাজ্য থেকে লুট করা ইউরোপীয় পুঁজি, আদিমজাতিদের কাছ থেকে বীভৎস বর্বরতায় ছিনিয়ে নেওয়া জমি ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, আর আফ্রিকা থেকে জোর করে লোহার খাঁচায় পুরে ধরে আনা লক্ষ লক্ষ নিগ্রো ক্রীতদাসের শ্রমে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। আর এভাবেই সেখানে গড়ে

ওঠে মানবিক অধিকারের জয়স্তম্ভ। ক্রমশ উত্তর অতলান্তিকের শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী দুনিয়ার কেন্দ্রে (core or centre) শিল্পজাত পণ্য উৎপাদক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে (periphery) রূপান্তরিত করে, কাঁচা মালের যোগানদার এবং শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে তাদের ব্যবহার করে। এভাবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিক কাঠামো নির্মিত হয়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হবার ফলে, এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে গড়ে ওঠে তুলনাক্রমে পরোক্ষ ধরনের নয়া সাম্রাজ্যবাদ। পুরাতন এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ আগের মত সরাসরি সামরিক শক্তিতে একটা দেশ দখল করে সেখানে প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করে না। সম্প্রতি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর্থিক অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে সেখানে বৈদেশিক ঋণ, পুঁজিবাদী দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাসমূহের মালিকানা ও উদ্যোগে বিদেশী পুঁজি নিয়োগ, প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের অসম বিনিময়, আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির উপর প্রভুত্ব, এবং বিদেশ নীতি ও সামরিক শক্তির পরোক্ষ চাপের মাধ্যমে তাদের পরনির্ভর পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক কাঠামো (dependent capitalism) গড়ে তুলতে বাধ্য করে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে তারা তৃতীয় বিশ্বের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সরকারে অধিষ্ঠিত এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের পূর্ণ সহায়তা লাভ করে। এভাবে তারা একদিকে তৃতীয় বিশ্বের বুভুক্ষিত শ্রমিকদের স্বল্প পারিশ্রমিকে শোষণ, আর অন্যদিকে নিজেদের মহামুনাফা (super profit) সুনিশ্চিত করে। আর পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ সংকটকে নয়া সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে নিরসন করবার চেষ্টা করে।

অন্য ভাবে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে পুঁজিবাদের আপাত সাফল্য প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যেরই নামান্তর। নয়া সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হলে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে কাঁচামাল ও শস্তা শ্রমশক্তির উৎস, শিল্পজাত পণ্যের বাজার এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না পারলে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ঐশ্বর্য অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কমে যাবে, আর সেই সংগে পুঁজিবাদী আদর্শেরও অবক্ষয় আরম্ভ হবে। প্রশ্ন এই, পুঁজিবাদ

ও নয়া সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস কোন পথে ত্বরান্বিত হবে।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যদি তথাকথিত উদারনীতি অবলম্বন করে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশসমুহের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে তাদের বাজার দখল করে নিতে দেয়, তবে নয়া সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল না হয়ে আরও শক্তিশালী হবে। আজকাল যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে তথাকথিত বিশ্ববাজারের অংগীভূত করবার লক্ষ্যের কথা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সরকার, তাদের বহুজাতিক সংস্থাগুলি, ওয়ার্লড ব্যাংক, আই.এম.এফ এবং তৃতীয় বিশ্বে তাদের মৃৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্যেরা ঘোষণা করে চলেছে, তার একমাত্র অর্থ হল ধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিক কাঠামোর প্রত্যন্ত সীমায় তৃতীয় বিশ্বের অবস্থানকে চিরায়ত করা, শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে নয়া সাম্রাজ্যবাদী দাপট বাড়াতে সাহায্য করা, আর তৃতীয় বিশ্বে চিরতরে পরাধীন এবং তুলনাক্রমে অনুন্নত ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। তেমনি ভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কাঠামোর কেন্দ্রস্থলে যেসব দেশ অবস্থিত, তথাকথিত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (New International Economic Order) নামে তাদের কাছে পুঁজি এবং কারিগরি সাহায্য ভিক্ষা করেও সাম্রাজ্যবাদের শক্তি খর্ব করা যাবে না। সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক কাঠামো ধ্বংস করবার এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আন্তর্জাতিক মুক্তির একমাত্র উপায় হল তৃতীয় বিশ্বের যৌথ আর্থিক স্বয়ম্ভরতা। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমশক্তির সুসংহত উপযোগ থেকেই এই স্বয়ম্ভরতা আসতে পারে। আর সে স্বয়ম্ভরতা যত দ্রুত গতিতে আসবে ততই সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। ইতিমধ্যেই অশেষ বাধাবন্ধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কিছুটা আর্থিক স্বয়ম্ভরতার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে বলেই শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা ও ক্রমবর্ধমান বেকারি দেখা দিয়েছে, আর তা থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেই তৃতীয় বিশ্বের বিশাল বাজার করায়ত্ত করবার জন্য তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মরিয়া হয়ে লেগেছে।

অনেকে বলে থাকেন যে পুঁজিবাদের তথাকথিত উদার রাজনৈতিক কাঠামোই এই আদর্শকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি

বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক কাঠামোতে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে আইনের শাসনের উপরেই জোর দেওয়া হয়। আইনের চোখে সব মানুষেরই সমান অধিকার, তাই প্রত্যেকেই সমান স্বাধীনতা ভোগ করে, অতএব সমান বিত্ত সঞ্চয় এবং সমান জাগতিক উন্নতি করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ মালিকানা ভিত্তিক গণতন্ত্রের (property-owning democracy) এই হল মূলমন্ত্র। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের আর্থসামাজিক কাঠামোর গুরুতর অসাম্য এবং কেন্দ্রীভূত বিত্তশক্তির ফলে তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও উদ্যোগ অল্প কিছু বিত্তবান মানুষের প্রভুত্ব ও মুনাফা শিকারে রূপান্তরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণই বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কুক্ষিগত। স্বল্পবিত্ত মানুষদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরে প্রায় কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই। একারণেই আমেরিকায় সাধারণত শতকরা ৪০ ভাগের বেশী মানুষ ভোটদানে অংশগ্রহণই করে না। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যে ৬০ শতাংশ ভোট দেয় না, তাদের অধিকাংশই স্বল্পবিত্ত কিংবা বিত্তহীন। তারা ধনিকের গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীন। প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার অংশ লাভ করে, আর কিছুটা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে, গত একশো বছরে পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক জীবনমানের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের কাঠামোর অভ্যন্তরে সে ভোগবাদী জাগতিক উন্নতি তাদের তুলনামূলক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ধনতন্ত্রের ভোগবাদী আদর্শে তাদের অনেকের দীক্ষা হয়েছে, আর তাদের অভ্যন্তরীণ তথা আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক চেতনা অনেকখানি ভোঁতা হয়েছে, কিন্তু তাদের মানবিক মুক্তি হয়নি।

অতএব পুঁজিবাদের আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক কাঠামো পৃথিবীর মানুষের আদর্শ হতে পারে না। বিশেষত ভারতবর্ষসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে তো নয়ই। এ সব দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ধনতান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে কোথাও উদার গণতন্ত্রের নামে, আর কোথাও বা খোলাখুলি স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমে, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে। এই কাঠামোর উপর আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদকে অবাধ অধিকার দিলে নিঃসন্দেহে এই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, কিন্তু অগণিত কৃষক-শ্রমিকের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মুক্তি হবে সুদূর পরাহত। দেশীয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী

আর আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যৌথ পীড়নে তাদের অবস্থান রয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় ও আর্থসামাজিক কাঠামোর পিরামিডের মূলদেশে। যেখানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তারা চিরদিন থেকেছে।

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মুনাফা শিকারের মাধ্যমে লব্ধ অল্প কিছু মানুষের বিত্ত, প্রভুত্ব এবং ভোগকেই মানব জাতির মুক্তি বলে কোনভাবেই গণ্য করা যায় না। যখন পৃথিবীর ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের এক কণাও কোনও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, যখন সমস্ত প্রাকৃতিক এবং উৎপাদিত সম্পদ সব মানুষের আর্থিক সুরক্ষা এবং সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য সমান ভাবে বন্টিত হবে, যখন কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীকে হাড়ভাঙ্গা কায়িক শ্রমে সারাজীবন অতিবাহিত করতে হবে না, যখন কায়িক শ্রম ক্রমশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মাধ্যমে বৌদ্ধিক শ্রমে রূপান্তরিত হবে, আর সব মানুষ পুঁজিবাদের তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিবর্তে সমষ্টিগত ভাবে সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ ও স্বাধীনতা ভোগ করবে, সেই শ্রেণীহীন শোষণহীন সমসমাজেই সম্ভব হবে মানবজাতির সামগ্রিক মুক্তি।

আর একমাত্র সমাজতন্ত্রই সে মুক্তি আনতে পারে। যে সমাজতন্ত্র ভাববাদী সমাজতন্ত্র নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যেহেতু একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই আদর্শকেও গতিশীল ইতিহাসের সঙ্গে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে প্রেরণা লাভ এবং শিক্ষা গ্রহণ করবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কোনও বিশেষ অতীত মডেলকে অপরিবর্তিত রেখে ভবিষ্যতে মানব মুক্তির পথ প্রশস্ত করা যাবে না। সামগ্রিক মানব মুক্তির আদর্শের রূপায়ণে বিজ্ঞানধর্মী পরীক্ষা-নিরিক্ষার ভিত্তিতে এবং সচেতন গণবিপ্লবের সাহায্যে অতীত ও বর্তমানের আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তহীন রূপান্তরের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের বিজয়রথ ইতিহাসের অন্তহীন বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে। পুঁজিবাদ ইতিহাসের শেষ কথা বলে না।